লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

Fortnightly The Ahmadi

Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ২০ ও ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ২১ রমযান, ১৪৪১ হিজরি | ১৫ হিজরত, ১৩৯৯ হি. শা. | ১৫ মে, ২০২০ ঈসাব্দ

Maryam Mosque in Galway.

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

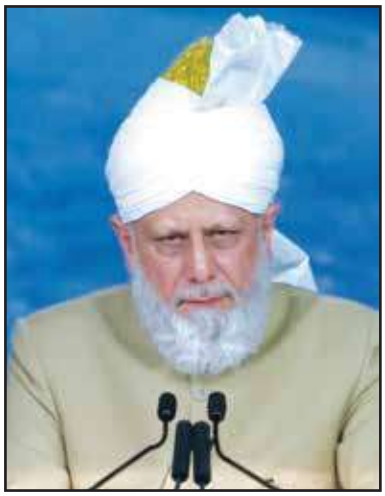

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুন নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাস রমযানঃ
দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য বয়ে আনে

বর্তমানে আমরা রোযার মাস অতিক্রম করছি। এই রোযা কোন উদ্দেশ্যহীন কর্ম নয় বরং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ, ত্বাকওয়া অবলম্বন এবং সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য খোদার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটি বিশেষ আয়োজন।

হাদীসে এসেছে 'রোযা ঢালস্বরূপ'। শুধুমাত্র অভুক্ত না থেকে যদি মানুষ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে আর তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি রোযায় অংশ নেয় তাহলে সে খোদার আশ্রয় লাভ করবে। প্রকৃতির সকল অনিষ্ট থেকে সে রক্ষা পাবে।

রোযা সম্পর্কে খোদার নির্দেশ সর্বদা স্মরণ রেখে রোযা রাখতে হবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযা সম্পর্কেঃ চোখের রোযা হল পুরুষ ও নারীদের দৃষ্টি অবনত রাখা। অনেকে নোংরা চলচ্চিত্র বা ছবি দেখে, যদি রোযার মাসে এই বদভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারা যায় আর ভাল অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে পরবর্তী সময়েও রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

জিহ্বার রোযা হল, অযথা-অনর্থক কথা-বার্তা বলবে না। যদি কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চায় তাহলে বলতে হবে 'ইন্নি সায়েমুন' অর্থাৎ, তুমি যাই বলো না কেন আমি রোযা রেখেছি, তোমার সাথে বিবাদে জড়িয়ে আমি আমার রোযা মাকরূহ্‌ করতে চাই না।

হাতের রোযা হল, কোন অপকর্ম করবে না। ত্বাকওয়া বা খোদাভীতির দাবী হচ্ছে, খোদা তা'লা যা বলেছেন তা পালন করবে এবং যা করতে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। খোদার নির্দেশরূপী ঢালের পিছনে আশ্রয় নাও নতুবা মৌখিক দাবী আত্মপ্রতারণার শামিল হবে।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেন, 'পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আদেশ ও নির্দেশে পরিপূর্ণ আর বহুবিধ নির্দেশের কয়েকশত শাখা-প্রশাখা বর্ণিত রয়েছে। রোযা সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন, রোযা আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি নিজে।'

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, 'একবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক মা দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন আর যে শিশুকেই দেখছিলেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছিলেন। সে মা আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর হারানো সন্তানকে খুঁজে ফিরছিলেন। পরিশেষে যখন আপন সন্তানকে খুঁজে পান তখন তাকে জড়িয়ে ধরে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিতে থাকেন। হুযূর পাক (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ এ দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর সাথীদের সম্বোধন করে বলেন, এই মা যেভাবে হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত, খোদা তা'লা তাঁর পথভ্রষ্ট বান্দাকে ফিরে পেয়ে এর চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।'

এক মা নিজ সীমিত সাধ্যের ভেতর থেকে সন্তানের চাহিদা পূরণ করেন আর তাকে সাময়িক নিরাপত্তা দেন আর অনেক সময় তাও দিতে পারেন না কিন্তু আমাদের খোদা যিনি গোটা বিশ্বের অধিপতি তিনি মানুষের জন্য কি-না করতে পারেন আর এমন কিছু কি আছে যা তিনি করেন না!

সুতরাং রোযার মাসে দোয়া করার সময় কেবল নিজের ব্যক্তিগত অভাবই খোদার সম্মুখে তুলে না ধরে বরং ইসলাম ধর্মের মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে দোয়া করা আবশ্যক। ইসলামের বিজয় ও আর্তমানবতার জন্য দোয়া করলে খোদা নিজ কৃপায় বান্দার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন এবং বান্দার অভাবও মোচন করবেন।

খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, তুমি বল আমি নিকটে আছি। আল্লাহ্‌ বলেন, আমার অস্তিত্বের প্রমাণ হচ্ছে, আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো, আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করবো। খোদার অস্তিত্বের প্রমাণের একটি হচ্ছে, তার সাথে কথোপকথন।

মধ্যবর্তী পর্দা অপসারণ করা হলে খোদার সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ হয়। রমযান যেহেতু ইবাদতের মাস তাই এ মাসে এই পর্দা ভেদ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে দোয়া কবুল হবার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হচ্ছে, খোদার ধর্মের বিজয়ের জন্য দোয়া, মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে বিশ্ববাসীর সমবেত হবার জন্য দোয়া আর বান্দাকে খোদার নিকটতর করার জন্য দোয়া।

বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন মারাত্মক সমস্যা ও প্রতিকূলতার সম্মুখিন হচ্ছে। একমাত্র খোদা তা'লার অনুগ্রহেই এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ সম্ভব। তাই এ সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত। বেশি বেশি দোয়া ও যাচনা করলে তিনি আমাদের দুর্বলতা ও উদাসীনতা ক্ষমা করে আমাদের জন্য তাঁর নৈকট্যের পথসমূহ সহজ করে দেবেন।

মহানবী (সা.)-এর একটি অতি প্রিয় দোয়া: "হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার ভালবাসা চাই এবং তার ভালবাসা চাই যে তোমাকে ভালবাসে। আমার হৃদয়ে এমন কাজের আকর্ষণ সৃষ্টি কর যার মাধ্যমে আমি তোমার ভালোবাসা পেতে সক্ষম হবো। হে আল্লাহ্‌ তোমার ভালবাসা আমার প্রাণ, ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও যেন আমার কাছে অধিক প্রিয় হয়।" আল্লাহ্‌ তা'লা মানবজাতিকে ভালবাসার এই মেলবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করুন, আমীন!

সূচিপত্রে

৩০ এপ্রিল ও ১৫ মে ২০২০

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ২৭ ফাতাহ্, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ** ৬

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **১১ সেপ্টেম্বর, ২০১০ ঈদুল ফিতরের খুতবা** ১৫

করোনার আদ্যোপান্তঃ সর্বশেষ গবেষণার আলোকে ২২
ডা. সেলিম মুহাম্মদ খান

কবিতাঃ শান্তির দ্বীন ২৭
সিবগাতুর রহমান

ইসলামী শিক্ষার অনুসরণে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ২৮
মসীহ্ উর রহমান

কবিতাঃ অপেক্ষা ৩১
মেহেদী হাসান মুসা

ঐশী উত্তরাধিকার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতী ও একজন পুন্যাত্মা সৈয়দ মুজবেহীন আলী ৩২
সৈয়দ সোহেল আহমেদ

সংবাদ ৩৪

শোক সংবাদ ৩৫

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৩৬

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন

www.theahmadi.org

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾

৯৫। তারা বললো, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ[১৭২৮] এ অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সুতরাং আমরা কি এ শর্তে তোমাকে (কিছু) কর দিব যাতে তুমি আমাদের এবং তাদের মাঝে একটি প্রতিবন্ধক[১৭২৯] স্থাপন করে দাও?'

১৭২৮। ইয়া'জূজ এবং মা'জূজ (গগ এণ্ড ম্যাগগ) শব্দদ্বয় মূল শব্দ আজজা থেকে উৎপন্ন এর অর্থ তার পদক্ষেপ দ্রুত ছিল, সে অগ্নিশিখায় পরিণত হল (লেইন) এবং এর দ্বারা নির্দেশ করে দূর প্রাচ্যের সিদিয়ার লোক অথবা যেমন অনেকে বলেন, উত্তর এশিয়া ও ইউরোপে বসবাসকারী জাতিসমূহ (এনসাইক, ব্রিট এবং যিউ এনসাইক, 'গগ ও ম্যাগগ' অধ্যায় এবং হিষ্টরিয়ানস হিষ্টরি দি ওয়ার্ল্ড, ২য় খণ্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা, এবং যিহিষ্কেল ৩৮:২-৬ ও ৩৯:৬)। এই শব্দগুলো পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জাতিসমূহের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা তারা জলন্ত অগ্নিকুণ্ড এবং ফুটন্ত জলধারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছে এবং এই সমস্ত জড় বস্তুর ব্যাপক ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সর্বপ্রকার পার্থিব উন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। অথবা এই জাতিগুলোর অস্থির আচরণ, যেমন তারা সর্বদা অধৈর্য এবং অস্থিরভাবে নতুন জয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, তা এই ইঙ্গিতও বহন করতে পারে।

ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা মতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটা পাশ্চাত্যের কোন খ্রিষ্টান শক্তির প্রতি আরোপিত বা সংশ্লিষ্ট। প্রথমত তারা বহু সংখ্যক শক্তিশালী এবং প্রবল প্রতাপশালী ক্ষমতাবান : "কিন্তু তুমি উঠিবে, ঝঞ্ঝার ন্যায় আসিবে, মেঘের ন্যায় তুমিও তোমার সহিত তোমার সকল সৈন্যদল ও অনেক জাতি সেই দেশ আচ্ছাদন করিবে" (যিহিষ্কেল ৩৮:৯) (গগ এন্ড ম্যাগগ) "ইয়া'জূজ-মা'জূজ... তাহাদের সংখ্যাসমূহের বালুকার তুল্য" (প্রকাশিত বাক্য-২০:৮)। "তোমরা বীরগণের মাংস খাইবে ও ভূপতিদের রক্ত পান করিবে" (যিহিষ্কেল-৩৯:১৮-১৯)। দ্বিতীয়ত পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে এবং দীপাঞ্চল থেকে তাদের আগমন দেখান হয়েছে : "আর তুমি আপন স্থান হইতে উত্তর দিকের প্রান্ত হইতে আসিবে এবং অনেক জাতি তোমার সঙ্গে আসিবে তাহারা সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবে" (যিহিষ্কেল-৩৮:১৫)। তৃতীয়ত তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে : "তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরিলে, তখন স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল" (প্রকাশিত বাক্য-২০:৯)। চতুর্থত উত্তরাঞ্চলে তাদের আবাসস্থল থেকে দেশান্তরে চলে যাবে এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করবে এবং যুদ্ধ বাধলে তারা তাদের দূরবর্তী উপনিবেশগুলো থেকে এসে একত্রে মিলিত হবে। "শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে তো পৃথিবীর চারিকোণস্থিত জাতিগণকে ও গগ ও ম্যাগগকে ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে" (প্রকাশিত বাক্য-২০:৮)। যিহিষ্কেল নবীর গ্রন্থে ইয়া'জূজকে "হে মনুষ্য সন্তান, তুমি রোশের, মেশকের ও তুবালের অধ্যক্ষ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, রোশ হচ্ছে রাশিয়া, মেশক মস্কো এবং তুবাল টবোলস্ক। গগ (ইয়া'জূজ)-কে ম্যাগগ বা মা'জূজের দেশীও বলা হয়েছে (যিহিষ্কেল ৩৮:২) এবং বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীদের মতে ম্যাগগ বা মাজূজ সেই এলাকা নির্দেশ করে যা প্রাচীন মতে সিদিয়া (রাশিয়া এবং তাতার) নামে পরিচিত, যে স্থান থেকে অতীতে অনেক বর্বর যাযাবর দল উত্থিত হয়েছিল। রাশিয়া যেহেতু মাজূজের দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেহেতু রোশ, মেশক এবং তুবালকে যথাক্রমে রাশিয়া, মস্কো এবং টবোলস্ক বলে ধরা যায়। ম্যাগগ বা মাজূজকে এক জাতির নাম বলে যিহিষ্কেল ৩৯:৬-তে এবং প্রকাশিত বাক্য-২০:৮-তে বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত যিহিষ্কেল-৩৯:৬ মাজূজকে যারা উপকূল নিবাসী তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছে। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ইয়া'জূজ এবং মাজূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) রাশিয়াসহ ইউরোপের কোন কোন বৃহৎ শক্তিকে নির্দেশ করে। কুরআন করীমে ১৮:৯৫ আয়াতে ইরানের উত্তর সীমান্তের রাজ্যসমূহে তাদের আক্রমণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এতে প্রতিপন্ন হয়, এই সকল উপজাতিরাই সাধারণত সিদিয়ান (Scythians) নামে পরিচিত ছিল। এটা এক ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা যে, প্রাচীনকালে সিদিয়ানরা বড় বড় দলে রাশিয়া থেকে ইউরোপের দিকে গিয়েছিল, তাদের গমন পথ ছিল ককেশাস পর্বতের উত্তরাঞ্চল (এনসাইক, ব্রিট, ১২ খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, ১৪শ সংস্করণ)। যখন ইউরোপে একদল অবস্থান স্থির করেছিল তখন নতুন নতুন দল পূর্ব দিক থেকে আসতে আরম্ভ করলো এবং তাদের পূর্বগামীদেরকে পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে সরিয়ে দিল। এরূপে ইউরোপের জাতিগুলোকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইয়া'জূজ এবং মাজূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এটা খুবই কৌতুহলদ্দীপক যে, এই দুই বীর প্রতীকের স্মৃতি আজও পর্যন্ত লন্ডন গিলড হলে দুই প্রতিমূর্তির আকারে সংরক্ষিত আছে। পুনঃ যিহিষ্কেল এবং প্রকাশিত বাক্যে প্রতিপন্ন হয় যে, ইয়া'জূজ ও মাজূজ এর প্রকাশিত হওয়ার কথা শেষ যুগে (আখেরী যামানায়) অর্থাৎ মসীহ্ (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের অব্যবহিত পূর্বে, "আর তুমি মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছাদন করিবার জন্য আমার প্রজা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে, উত্তরকালে এইরূপ ঘটিবে; আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনিব যেন জাতিগণ আমাকে জানিতে পারে" (যিহিষ্কেল-৩৮:১৬ এবং প্রকাশিত বাক্য-২০:৭-১০ ও দেখুন)। এই আয়াতসমূহ প্রতিপন্ন করে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন জাতির প্রতি ইশারা করছে যারা সেই সুদূর ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে। যে যুগে ইয়া'জূজ ও মাজূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) প্রকাশিত হবে সেই যুগে যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহামারী এবং ভয়ানক দৈবদুর্বিপাক ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১৭১৮:১৭২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৭২৯। সিদিয়ানরা (Scythians) বা ইয়া'জূজ-মা'জূজ কৃষ্ণ সাগরের উত্তর এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ দখল করেছিল এবং এই সকল এলাকা থেকে দারবন্দ গিরিপথের মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে পারস্য জয় করেছিল। সাইরাস তাদেরকে পরাস্ত করে পারশ্যবাসীকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন (হিষ্টরিয়ানস হিষ্টরী অব দি ওয়ালর্ড)। যে গিরিপথের মধ্য দিয়ে সিদিয়ানরা (Scythians) পারস্য দেশ আক্রমণ করেছিল, হিরোডোটাসের মতে ঠিক সেই স্থানে বিখ্যাত দারবন্দ (Derband) প্রাচীর দন্ডায়মান ছিল।

দারবেন্ড বা দারবন্দ (Derband) পারস্যের এক শহর দাঘেস্তান (Daghestan) প্রদেশের অন্তর্গত ককেশিয়া (Coucasia) কাসপিয়ান উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী স্থান... এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে সমুদ্রাভিমুখে ৫০ মাইল দীর্ঘ ককেশাস প্রাচীরের দিগন্ত, যা কিনা আলেকজান্ডারের প্রাচীর নামেও খ্যাত, যা লৌহ দ্বারা বা কাস্পিয়ান দ্বারা এর সংকীর্ণ পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি আসল অবস্থায় উচ্চতায় ২৯ ফুট এবং প্রস্থে ১০ ফুট ছিল এবং প্রহরার জন্য উচ্চকক্ষ পারস্য সীমান্ত রক্ষায় যথার্থই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল (এনসাইক, ব্রিট, 'দারবন্দ' অধ্যায়)।

ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্যের বিপরীতে জনসাধারণ্যের প্রচলিত ধারণা হল, উক্ত প্রাচীর সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযান ক্ষণিকের ঘূর্ণিবাত্যার মত ছিল, যে সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে এরূপ প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা করার মত সময় দেয়া অসম্ভব ছিল। উপরন্তু অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এত বড় দায়িত্ব পালনের অবকাশ ছিল না। জনসাধারণের এই ধারণা সৃষ্টির কারণ কুরআন করীমের ব্যাখ্যাকারী মুসলমানরা যুলকারনাইনকে আলেকজান্ডার বা সেকান্দার বাদশা বলে ভুল করেছিলেন। নিম্ন বর্ণিত ঘটনা ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, সাইরাস সেটি নির্মাণ করেছিলেন : (ক) সিদিয়ানদের ক্ষমতা খর্ব করে দেয়ার জন্য সাইরাসের পুত্রের মৃত্যুর পর দারিয়ূস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গ্রীসের মধ্য দিয়ে ইউরোপের দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করেন। এটা এক অকল্পনীয় ব্যাপার যে, তিনি (দারিয়ূস) এত দীর্ঘ ও সংকটময় পথে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দিক থেকে, অথচ তারা উত্তর দিক থেকে তাঁর অতি নিকটবর্তী ছিল। অতএব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হল, সেই প্রকান্ড প্রাচীরের অস্তিত্ব (যা তার পূর্ববর্তী সাইরাসই কেবল নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন) তাঁর (দারিয়ূসের) জন্য আক্রমণকে অসম্ভব করে দিয়েছিল। নিজের দেশকে উত্তর থেকে আক্রমণের জন্য অরক্ষিত রেখে বিশাল সৈন্য বাহিনীসহ অপরদিকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না যদি না তাঁর সামনে কোন বাধা বা প্রাচীর থাকতো।

(খ) সাইরাসের সময়ের পূর্বে সিদিয়ানরা পারস্যের উপর ঘন ঘন আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিজয়ের পরে এই সকল আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, সাইরাস অবশ্যই এমন বাধা সৃষ্টি করেছিলেন যা এই সমস্ত অভিযান কার্যকরভাবে প্রতিহত করেছিল এবং সেই বাধা ছিল দারবন্দের দেয়াল যাকে ভুলক্রমে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফ

নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, **"তোমাদের মাঝে নবুওয়্যত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তি-মূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।"** অতঃপর তিনি (সা.) নিরব হয়ে গেলেন। *(মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)*

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "কিছু লোক *ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আমিলুস সালিহাতি লাইয়াসতাখলিফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম"* আয়াতটিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা *'মিনকুম'*– (তোমাদের মধ্য হতে– অনুবাদক)-এর অর্থে শুধু সাহাবাদেরকে (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন, খিলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের নাম-গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হল, খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধঃপতনের অশুভ-গর্ভে নিপতিত হয়ে গেল।

পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন ও পুণ্যবানদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ– উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে, তখন আল্লাহ্‌র এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "কিছু লোক **ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আমিলুস সালিহাতি লাইয়াসতাখলিফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম"** আয়াতটিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা **'মিনকুম'**– (তোমাদের মধ্য হতে– অনুবাদক)-এর অর্থে শুধু সাহাবাদেরকে (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন, খিলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের নাম-গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হল, খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধঃপতনের অশুভ-গর্ভে নিপতিত হয়ে গেল।

এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, তবে আমি কীভাবে বলতে পারি যে, সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি? অথচ এখানে স্থায়ী খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এ খিলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে, তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?

যেহেতু মানুষের কোন স্থায়ীত্ব নেই, তাই আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্ত্বার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি -খিলাফত সৃষ্টি করেছেন, যেন রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী কখনো বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত মানে, মূর্খতাবশতঃ সে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তা'লার উদ্দেশ্য কখনো এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্ত্বায় কেবল তিরিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন, এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, তবুও কোন পরওয়া নেই।" *(শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খিলাফতের রজ্জু ধারণ করে এর আশীষ হতে কল্যাণমণ্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন!

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বি সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

হে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণ! আমার কথা শুনো

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে আমার ভাইয়েরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও আশীষ বর্ষিত হোক। এরপর হে আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাগণ! আমার কথা শুনো। হে রোম, সিরিয়া-পারশ্য, মিশর, কাবুল এবং মক্কা ও মদীনার অধিবাসীগণ! হে যারা আমাদের সরদার আমাদের নবী খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর হিজরতের পরের আবাসস্থল ও অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমাদের সাহায্য করুন এবং তিনি যেন এ ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সহায় হন। তিনি আমাদের ও তোমাদের সুস্পষ্ট সত্যের দিকে হেদায়াত দান করেছেন।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! মহিমান্বিত প্রতাপশালী আল্লাহ্ যখন এই পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তিনি দেখলেন যে, এখানে ব্যাপক নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে, সততা কমে গেছে, হৃদয়গুলো পাষাণ হয়ে গেছে ও অন্তরসমূহ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। যতই দিন গড়াচ্ছে ও মাস যতই অতিবাহিত হচ্ছে নৈরাজ্য ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বিপদাবলী কঠোরতর হচ্ছে। আর পৃথিবী বিভিন্ন ধরণের বিদআতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কুরআন ও সুন্নতকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, নিয়তের মাঝে বিপর্যয়ের অভিপ্রকাশ ঘটেছে এবং তাদের হৃদয়ে কামনাবাসনার প্রবল আকর্ষণ স্থান করে নিয়েছে। তাদের ললাট হতে পুণ্যের জ্যোতিঃ মুছে গেছে। বরং তাদের চেহারায় বিশৃঙ্খলার ছাপ সুস্পষ্ট ও তাদের হৃদয় ঘোর কালিমায় পূর্ণ ও মৃত। তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং শুষ্ক হয়ে গেছে। তারা কাপুরুষ ও পশ্চাৎমুখী। তারা কুচিন্তা ও সন্দেহপ্রবণ।

আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকেই আহ্বান করছি এবং সম্মানিত আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর ওসীয়্যতের দিকে আহ্বান করছি, যাঁর (সা.) ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত খোদার হাজার হাজার আশীষ বর্ষিত হোক। অত্যধিক স্নেহশীল ক্ষমাকারী খোদার আশীষ, যা এই দেশে প্রকাশিত হয়েছে, আমি তোমাদেরকে তার সুসংবাদ দিচ্ছি। আর আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র (আশীষের) দিন ও সত্যবাদিগণের সুপ্রভাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমাদের প্রভু যিনি সবচে' অধিক কৃপাকারী তাঁর পক্ষ থেকে যে রহমত অবতীর্ণ হয়েছে আমি তোমাদেরকে তারও সুসংবাদ দিচ্ছি। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! মহিমান্বিত প্রতাপশালী আল্লাহ্ যখন এই পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তিনি দেখলেন যে, এখানে ব্যাপক নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে, সততা কমে গেছে, হৃদয়গুলো পাষাণ হয়ে গেছে ও অন্তরসমূহ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। যতই দিন গড়াচ্ছে ও মাস যতই অতিবাহিত হচ্ছে নৈরাজ্য ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বিপদাবলী কঠোরতর হচ্ছে। আর পৃথিবী বিভিন্ন ধরণের বিদআতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কুরআন ও সুন্নতকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, নিয়তের মাঝে বিপর্যয়ের অভিপ্রকাশ ঘটেছে এবং তাদের হৃদয়ে কামনাবাসনার প্রবল আকর্ষণ স্থান করে নিয়েছে। তাদের ললাট হতে পুণ্যের জ্যোতিঃ মুছে গেছে। বরং তাদের চেহারায় বিশৃঙ্খলার ছাপ সুস্পষ্ট ও তাদের হৃদয় ঘোর কালিমায় পূর্ণ ও মৃত। তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং শুষ্ক হয়ে গেছে। তারা কাপুরুষ ও পশ্চাৎমুখী। তারা কুচিন্তা ও সন্দেহপ্রবণ।

মহানবী (সা.) যা কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন, তা তারা ভুলে গেছে। কুরআনের নসীহত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.) যা বলে গিয়েছিলেন তারা তা-ও ভুলে গিয়েছে। তাদের হাতে এখন শুধু বাকলই রয়ে গেছে এবং তারা ঈমানের মূলকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারা জগত ও জগত পুজায় ঝুঁকে পড়েছে ও শয়তানের পথ বেছে নিয়েছে। তদের অধিকাংশকেই তুমি কেবল দুস্কৃতকারী, শঠ ও পাপকার্যে নির্ভীক দেখতে পাবে। তোমরা নিজেরাই সাক্ষী, অধিকাংশ আলেম মুখে যা বলে, কাজে তা করে না। সাধকদের দেখছো লোক দেখানো কর্ম করতে কিন্তু তাদের মাঝে নিষ্ঠা নেই। আর তারা দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে না এবং ত্বাকওয়া অবলম্বন করে না।

(হাকীকাতুল মাহ্‌দী, বাংলা সংস্করণ, পৃ: ২৩)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ২৭ ফাতাহ্, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

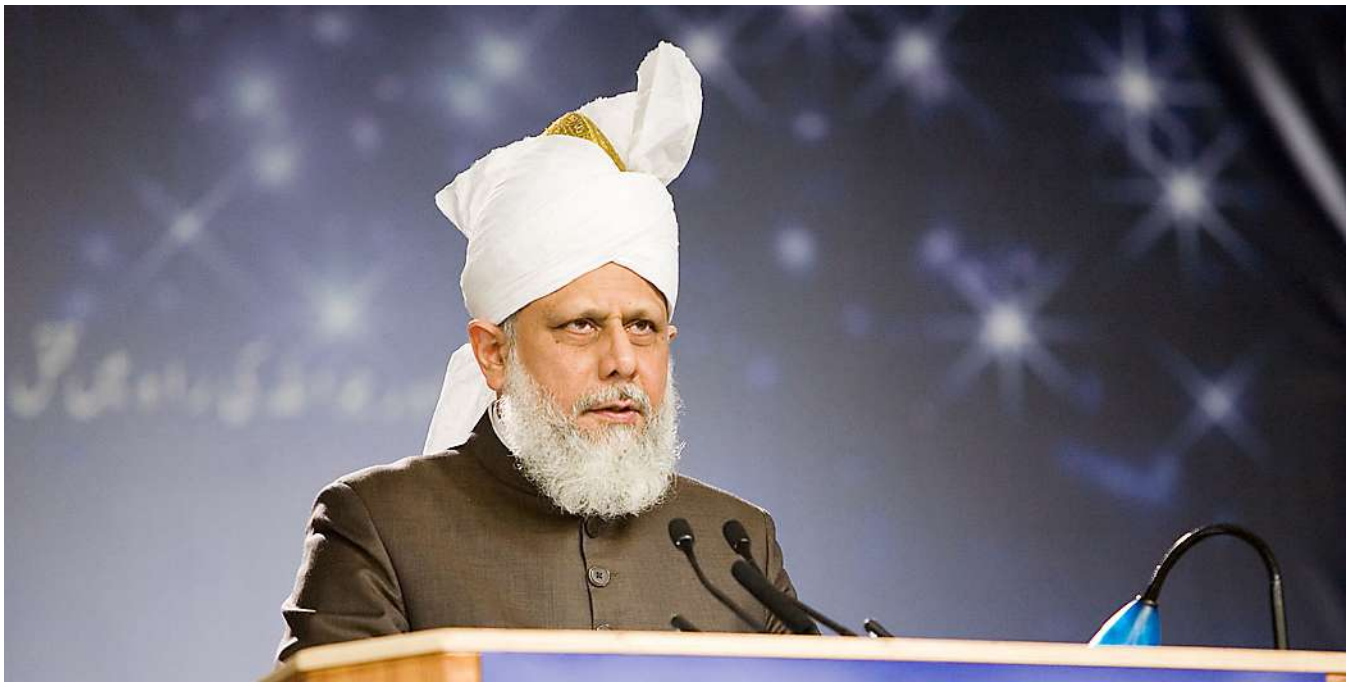

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, তার সম্পর্কে আজ আমি আরো কিছু কথা বর্ণনা করবো। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় নিযুক্ত বারোজন নকীব বা নেতার একজন ছিলেন। *[তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬১, সা'দ বিন উবাদা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯০]*

তার সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু সায়েদা বংশের সদস্য ছিলেন আর পুরো খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। (তিনি) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে বিশিষ্ট আনসারদের মধ্যে গণ্য হতেন। এমনকি মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কতক আনসার (সাহাবী) খিলাফতের জন্য তার নামই প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থাৎ, আনসারদের মধ্য হতে যে নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল তা ছিল তারই নাম। হযরত উমর (রা.)'র যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন। *[সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.), প্রণেতা হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এম.এ. পৃষ্ঠা ২৩০]*

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.), মুনযের বিন আমর (রা.) এবং আবু দজানাহ্ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর নিজ গোত্র বনু সায়েদার প্রতিমা ভাঙ্গেন। *[তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬১, সা'দ বিন উবাদা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯০]*

মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন বনু সায়েদার বসতিস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, হযরত মুনযের বিন আমর এবং হযরত

আবু দজানাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাদের কাছে তশরীফ নিয়ে আসুন। আমাদের কাছে সম্মান, সম্পদ, শক্তি এবং প্রতিপত্তি রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এটিও নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার জাতিতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার খেজুরের বাগান এবং কূঁপ আমার চেয়ে বেশি হবে, অধিকন্তু আমার ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য আর জনবলও রয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু সাবেত! এই উটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আদিষ্ট।" *[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২, আল বাবুস সাদেস ফি কদুমাতে (সা.) আবাতেনেল মাদিনাহ . . ., দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯৩]*

অর্থাৎ সে নিজের ইচ্ছায় যেখানে যেতে চায় যাবে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বনু সায়েদা গোত্রের নকীব বা নেতা ছিলেন। যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, যেসব নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে তার নামও ছিল।

বলা হয়, অওস এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে এমন কোন বংশ ছিল না যাতে একাধারে চার-প্রজন্ম পর্যন্ত দানশীল বা বড় উদার মনের অধিকারী হয়েছেন, কেবলমাত্র দুলায়েম ছাড়া। এরপর তার পুত্র উবাদাহ্, অতপর তার ছেলে সা'দ, তারপর হয়েছে তার ছেলে কায়েস। দুলায়েম এবং তার বংশের বদান্যতা সম্পর্কে অনেক ভালো খ্যাতি ছিল। *[উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪১, সা'দ বিন উবাদা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৩]*

মহানবী (সা.) যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে আসেন তখন সা'দ মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রত্যহ একটি বড় পাত্র প্রেরণ করতেন যাতে 'সরীদ' অর্থাৎ মাংস ও রুটির মিশ্রণে রান্না করা (খাবার) অথবা দুধ দিয়ে বানানো 'সরীদ', অথবা সিরকা ও জলপাই দিয়ে বানানো 'সরীদ' অথবা চর্বি দিয়ে বানানো ('সরীদ')-এর পাত্র প্রেরণ করতেন আর বেশিরভাগ সময় মাংসে পাকানো সরীদের পাত্রই পাঠানো হতো। সা'দ (রা.)-এর পাত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের বাড়িতেও ঘুরতে থাকতো। *[তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬১, সা'দ বিন উবাদা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯০]*

মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন বনু সায়েদার বসতিস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, হযরত মুনযের বিন আমর এবং হযরত আবু দজানাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাদের কাছে তশরীফ নিয়ে আসুন। আমাদের কাছে সম্মান, সম্পদ, শক্তি এবং প্রতিপত্তি রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এটিও নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার জাতিতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার খেজুরের বাগান এবং কূঁপ আমার চেয়ে বেশি হবে, অধিকন্তু আমার ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য আর জনবলও রয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু সাবেত! এই উটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আদিষ্ট।"

অর্থাৎ এই খাবার (তাঁর) স্ত্রী'দের জন্যও আসতো। কতক রেওয়ায়েত এমনও আছে যা থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে এমন দিনও আসতো যখন কোন খাবারই থাকতো না। *[সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুব্বাহ ওয়া ফাযলুহা, বাব ফাযলুল হুব্বাহ, হাদীন সং ২৫৬৭]*

হতে পারে- তিনি (অর্থাৎ সাদ) প্রতিদিন নয়– অধিকাংশ সময় প্রেরণ করতেন অথবা কেবল প্রথম দিকে পাঠাতেন আর এটিও হতে পারে যে, মহানবী (সা.) স্বীয় বদান্যতার কারণে, দরিদ্রদের প্রতি খেয়াল রেখে অনেক সময় তা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন, অতিথিদের খাইয়ে দিতেন– তাই নিজের বাড়িতে আর কিছুই থাকতো না।

যাহোক, আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন তখন তাঁর সমীপে কোন হাদীয়া বা উপহার আসে নি। প্রথম যে উপহার নিয়ে আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলাম তা হল, একটি পেয়ালা বা পাত্র, যাতে গমের রুটির 'সরীদ' ছিল অর্থাৎ মাংসের সরীদ আর দুধের 'সরীদ' ছিল– আমি তা তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করি। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার মা এই পাত্রটি আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ এতে বরকত সৃষ্টি করে দিন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের ডাকেন আর তারাও এথেকে আহার করেন। তিনি বলেন, আমি কেবল দরজা পর্যন্তই পৌঁছি এমন সময় সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)ও একটি পাত্র নিয়ে উপস্থিত হন, যা তার দাস নিজের মাথায় বহন করে এনেছিল, সেটি অনেক বড় ছিল। আমি হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ি, আমি দেখার উদ্দেশ্যে সেই পাত্রের ওপর থেকে কাপড়ের ঢাকনাটি অপসারণ করি। আমি এতে 'সরীদ' দেখি, এতে হাড় ইত্যাদি ছিল, সেই দাস তা তাঁর খিদমতে অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করে।

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমরা বনু মালেক বিন নাজ্জার এর বাড়িতে থাকতাম, আমাদের মধ্য হতে তিন অথবা চারজন প্রতিরাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পালা করে খাবার নিয়ে উপস্থিত হতো। মহানবী (সা.) সাতমাস পর্যন্ত হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। সেদিনগুলোতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)-এর (বাড়ি থেকে) প্রতিদিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে পাত্র আসতো আর এতে কোন ব্যতিক্রম হতো না। এখানে কিছুটা স্পষ্টও হয়ে গেল যে, প্রথমে প্রত্যহ খাবার আসতো, সাত মাস পর্যন্ত নিয়মিত আসতো, এরপরেও এসে থাকবে কিন্তু সম্ভবত নিয়মিত নয়। এরপর বলেন, এ সম্পর্কে যখন হযরত উম্মে আইয়ূব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মহানবী (সা.) আপনার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন তাই আপনি বলুন যে, মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় বা পছন্দের খাবার কি ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি কোন বিশেষ খাবারের নির্দেশ দিয়েছেন আর তা তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে বলে আমি দেখি নি আর আমরা কখনো এটিও দেখিনি যে, তাঁর সমীপে খাবার পেশ করা হয়েছে আর তিনি তাতে ত্রুটি (খুঁজে) বের করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আইয়ূব (রা.) আমাকে বলেছেন, এক রাতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি পাত্র প্রেরণ করেন যাতে 'তোফায়শল' (অর্থাৎ এক প্রকার ঝোল বা স্যুপ) ছিল। তিনি (সা.) তা তৃপ্তিসহকারে পান করেন, এছাড়া আমি তাঁকে কখনো এভাবে তৃপ্তি সহকারে পান করতে দেখি নি। এরপর আমরাও মহানবী (সা.)-এর জন্য এটি প্রস্তুত করতাম, যে খাবারই আসতো (ইচ্ছা হলে খেতেন) কখনো এটি বলেন নি, এটি নিয়ে আসো, অমুক (জিনিস) রান্না কর, কখনো (খাবারের) ত্রুটি বের করেন নি, কিন্তু এই খাবারটি (অর্থাৎ ঝোল বা স্যুপ) তার পছন্দ হয় আর তিনি খুবই আগ্রহভরে তা খান বা পান করেন। এরপর সাহাবীরা জেনে গিয়েছিলেন যে, এটি মহানবী (সা.)-এর পছন্দ বা প্রিয়, এরপর তারা সেই মোতাবেক (খাবার) প্রস্তুত করতেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য প্রসিদ্ধ খাবার 'হারীস' বানাতাম যা গম এবং মাংস দিয়ে বানানো হয়– যা তিনি (সা.)-এর পছন্দ ছিল। রাতের খাবারে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে খাবারের পরিমাণ অনুসারে পাঁচজন থেকে আরম্ভ করে ষোলজন পর্যন্ত যোগ দিতেন। *[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৫, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ফি কুদুমিহি (সা.) আবাতেনুল মাদিনাহ . . ., দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯৩] [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২, আল বাবুস সাদেস ফি কদুমাতে (সা.) আবাতেনুল মাদিনাহ . . ., দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯৩] [লুগাতুল হাদীস ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭২, আলী আসেফ প্রিন্ট প্রেস, লাহোর ২০০৫]*

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর বাড়িতে মহানবী (সা.)–এর অবস্থানের দিনগুলোর উল্লেখ করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও লিখেছেন যে, সেই বাড়িতে তিনি সাত মাস পর্যন্ত অথবা ইবনে ইসহাকের ভাষ্যানুসারে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। মোটকথা, মসজিদে নববী এবং তৎসংলগ্ন বিভিন্ন কক্ষ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি (সা.) সেই জায়গাতেই (বা বাড়িতেই) অবস্থান করেন। আবু আইয়ূব (রা.) তাঁর সমীপে আহার্য প্রেরণ করতেন আর (তার খাওয়ার পর) যে খাবার ফিরে আসতো তা তিনি নিজে খেতেন। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) ভালোবাসা ও নিষ্ঠার কারণে সেই জায়গায় আঙ্গুল রাখতেন যেখান থেকে মহানবী (সা.) খাবার খেয়েছেন। অন্য সাহাবীরাও সাধারণত তাঁর কাছে খাবার প্রেরণ করতেন। যেমন তাদের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর নামও বিশেষভাবে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। *[সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.), প্রণেতা হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এমন এ. পৃ. ১৬৮]*

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের বাড়িতে তশরীফ নিয়ে আসুন, হযরত সা'দ (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.) তার বাড়িতে যান। হযরত সা'দ খেজুর এবং তিল নিয়ে আসেন এরপর মহানবী (সা.)-এর জন্য দুধের বাটি নিয়ে আসেন, যা থেকে তিনি পান করেন। *[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০, ৪র্থ বাব, ফি আকলিহি (সা.), ইতআমাতি মুখতালিফাহ, ফি আকলিহি (সা.) আলকাসবু ওয়শ শাহসাম, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯৩]*

সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর পুত্র কায়েস বিন সা'দ বর্ণনা করেন, সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন এবং তিনি বলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ অর্থাৎ মহানবী (সা.) গৃহবাসীদের সালাম করেন। কায়েস বলেন, আমার পিতা সা'দ নিচুস্বরে উত্তর দেন। কায়েস বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি মহানবী (সা.)কে গৃহাভ্যন্তরে আসতে বলবেন না? হযরত সা'দ অর্থাৎ পিতা তার পুত্রকে এই উত্তর দেন যে, মহানবী (সা.)-কে আমাদেরকে বেশি বেশি সালাম করতে দাও। মহানবী (সা.) আবার সালাম করে ফিরে যেতে লাগলেন। [অর্থাৎ, হযরত সাদ বলেন, মহানবী (সা.) সালাম দেন, আমি নিচুস্বরে উত্তর দেই যাতে মহানবী (সা.) পুনরায় সালাম দেন আর এভাবে আমাদের বাড়ি আশিস লাভ করে, যাহোক তিনি বলেন, মহানবী (সা.) সালাম করে ফিরে যাচ্ছিলেন] তখন হযরত সা'দ (রা.) তাঁর পেছনে ছুটেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার সালাম শুনে নিচুস্বরে উত্তর দেই যেন আপনি আমাদের প্রতি অধিক শান্তি বা আশিস কামনা করেন। এরপর তিনি (সা.) সা'দ এর সঙ্গে ফিরে আসেন। সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-কে গোসল করার অনুরোধ করলে তিনি (সা.) গোসল করেন। হযরত

সা'দ (রা.) তাঁকে 'যাফরান' বা 'ওরস'-এ রাঙ্গানো একটি লেপ দেন। (যাফরান বা ওরস) ইয়েমেন অঞ্চলে জন্মানো হলুদ বর্ণের একটি গাছ যা দিয়ে কাপড় রাঙ্গানো হয়। তিনি তা নিজের শরীরে জড়িয়ে নেন এরপর মহানবী (সা.) নিজের হাত তুলে বলেন, "হে আল্লাহ্! সা'দ বিন উবাদাহ্‌র সন্তানদের প্রতি তুমি তোমার আশিস ও কৃপা বর্ষণ কর"। *[উসদুল গাবা ফি মা'রেফাতিস সাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪৪২, সা'দ বিন উবাদা; দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত] [উমদাতুল কারী, শারাহ্ সহীহুল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২, কিতাবুল ইলম, দারুল ফিকর বৈরুতে মুদ্রিত]*

এই রেওয়ায়েতটি হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) একবার হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করতে চান, গৃহাভ্যন্তরে যেতে চান এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ বলেন। হযরত সা'দ নিচুস্বরে বলেন, ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ্, কিন্তু তা মহানবী (সা.) শুনতে পান নি– এমনকি মহানবী (সা.) তিনবার সালাম করেন আর সা'দ তিনবারই একই উত্তর দেন যা মহানবী (সা.) শুনতে পান নি, তাই মহানবী (সা.) ফেরত যেতে উদ্যত হন। (তখন) হযরত সা'দ তাঁর পিছনে পিছনে যান আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি যতবারই সালাম বলেছেন আমি তা নিজের কানে শুনেছি এবং এর উত্তর দিয়েছি। কিন্তু আপনি শুনেন নি। আপনার কাছে আমার আওয়াজ পৌঁছে নি। আমরা চাচ্ছিলাম আমি যেন অজস্রধারায় আপনার শান্তি ও কল্যাণের দোয়া লাভ করি। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-কে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং খাদ্য হিসেবে কিশমিশ উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) তা খাওয়ার পর বলেন, 'পুণ্যবান লোকেরা তোমার খাবার খেতে থাকুক এবং ফিরিশ্‌তারা তোমার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকুক আর রোযাদাররা তোমার বাড়িতে ইফতারী করবে এমনটিই হোক'। অর্থাৎ তিনি (সা.) তার জন্য (এই) দোয়া করেন। *[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭; মুসনাদ আনাস বিন মালেক, হাদীস নম্বর- ১২৪৩৩, আলামুল কুতুব, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

আল্লামা ইবনে সিরীন বর্ণনা করেন, সন্ধ্যা হলে কোন ব্যক্তি সুফফাবাসীদের যে কোন এক বা দু'জনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেত। কিন্তু হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আশিজন সুফফাবাসীকে খাবার খাওয়ানোর জন্য নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। *[আল ইসাবা ফি তাময়ীযিস সাহাব, ৩য় খণ্ড, সা'দ বিন উবাদা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

অর্থাৎ অধিকাংশ সময় এমনটি হত। কিন্তু এমন রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, সুফফাবাসীদের এমন দিনও কেটেছে যখন তাদের অনাহারে থাকতে হয়েছে। যাহোক, সাহাবীরা সচরাচর এই দরিদ্র (সাহাবাদের) দেখাশোনা করতেন যারা মহানবী (সা.)-এর দ্বারে পড়ে থাকতেন আর যিনি তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্নবান ছিলেন তিনি হলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)।

মহানবী (সা.) মদীনায় আসার এক বছর পর সফর মাসে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখী মহাসড়ক ধরে 'আবওয়া' অভিমুখে যাত্রা করেন, যা 'জুহফা' থেকে ২৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মহানবী (সা.)-এর মাতা হযরত আমেনার সমাধিও এখানে রয়েছে। (তখন) মহানবী (সা.)-এর পতাকা সাদা রঙের ছিল। সেসময় তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত বা আমীর নিযুক্ত করেন। *[আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫, বাব: গাযওয়াতুল আবওয়া, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত] [এটরাস সীরাতে নবী (সা.), পৃ. ৮৪, দারুস সালাম, ১৪২৪ হিজরী সনে মুদ্রিত]*

'আবওয়া'র অভিযানের অপর নাম 'ওদ্দান'-এর অভিযান বলা হয়ে থাকে। সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব 'ওদ্দান'-এর অভিযান সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল কখনো তিনি নিজেই সাহাবীদের সাথে নিয়ে অভিযানে বের হতেন, আবার কখনো কোন সাহাবীর নেতৃত্বে কোন সৈন্যদল প্রেরণ করতেন। ঐতিহাসিকরা উভয় প্রকার অভিযানের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন। অতএব যে অভিযানে মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশ নিয়েছেন, ঐতিহাসিকরা সেটির নাম দিয়েছেন 'গাযওয়া' (বা যুদ্ধ)। আর যাতে তিনি (সা.) স্বয়ং অংশ নেন নি তার নাম দেয়া হয়েছে 'সারিয়্যা' বা 'বা'ছ' (অর্থাৎ অভিযান)। কিন্তু এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, গাযওয়া এবং সারিয়্যা উভয়ই নির্দিষ্টভাবে তরবারির যুদ্ধ হবে– এমনটি আবশ্যক নয়; অর্থাৎ তরবারির জিহাদের উদ্দেশেই বের হতে হবে-এটি আবশ্যক নয়। "বরং এমন প্রত্যেক সফরকে গাযওয়া বলা হয় যাতে তিনি (সা.) যুদ্ধাবস্থায় অংশগ্রহণ করেছেন, সেটি বিশেষভাবে লড়াই বা যুদ্ধ করার মানসে করা না হলেও। একইভাবে এমন প্রত্যেকটি অভিযানকে ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় সারিয়্যা বা বা'ছ বলা হয় যা তাঁর (সা.) নির্দেশে কোন দল করেছে, সেটির উদ্দেশ্য লড়াই বা যুদ্ধ না হলেও। কিন্তু কতিপয় লোক না জানার কারণে সকল গাযওয়া এবং সারিয়্যাকে লড়াই বা যুদ্ধাভিযান ভেবে বসে, যা সঠিক নয়।

এটি বলা হয়েছে যে, তরবারির জিহাদের অনুমতি হিজরতের দ্বিতীয় বছর সফর মাসে এসেছিল।" পূর্বের বিভিন্ন খুতবায় এটি বর্ণিত হয়েছে। "যেহেতু কুরাইশদের হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাদের ভয়ঙ্কর সব কর্মকাণ্ডের বিপরীতে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি (সা.) এ মাসেই মুহাজিরদের একটি দলকে সঙ্গে করে আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে খাযরাজ গোত্রের নেতা

সা'দ বিন উবাদাহ্‌কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন আর মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মক্কার পথে যাত্রা করেন এবং অবশেষে ওদ্দান নামক স্থানে পৌঁছেন। এই বিবরণ পূর্বেও এসেছে যে, সেই অঞ্চলে বনু যামরা গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। এই গোত্রটি বনু কিনানা'র একটি শাখা ছিল, এভাবে সম্পর্কের দিক থেকে যেন তারা কুরাইশদের চাচাতো ভাই ছিল। এখানে পৌঁছে মহানবী (সা.) বনু যামরা গোত্রের নেতার সাথে আলোচনা করেন এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের মাঝে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়, যার শর্তগুলো হল বনু যামরা মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতায় ইন্ধন যোগাবে না। মহানবী (সা.) তাদেরকে অর্থাৎ বনু যামরাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করলে তারা তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দিবে। অপরদিকে তিনি (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার করেন যে, সকল মুসলমান বনু যামরার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে আর প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করবে। এই চুক্তি রীতিমত লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাতে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করে। পনের দিনের অনুপস্থিতির পর মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন। ওদ্দান-এর যুদ্ধের অপর নাম আবওয়া'র যুদ্ধও বটে, কেননা ওদ্দান-এর নিকটেই আবওয়া'র বসতি রয়েছে আর এই স্থানেই মহানবী (সা.)-এর শ্রদ্ধেয়া মাতার ইন্তেকাল হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এই যুদ্ধে বনু যামরার পাশাপাশি মক্কার কুরাইশদেরও মহানবী (সা.) দৃষ্টিপটে রেখেছিলেন। এর অর্থ হল সত্যিকার অর্থে তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের ভয়ানক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করা আর সেই বিষাক্ত ও ভয়াবহ প্রভাব দূর করাও উদ্দেশ্য ছিল, যা কুরাইশদের কাফেলা বা বিভিন্ন দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের গোত্রগুলোর মাঝে সৃষ্টি করছিল। "কুরাইশরা বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করত এবং এ কারণে সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।" *[সীরাত খাতামান্নাবীঈন (সা.), প্রণেতা- হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ. (রা.), পৃ. ৩২৭-৩২৮]*

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে, ওয়াকদী, মাদায়েনী এবং ইবনে কালবী'র মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক এবং ইবনে উকবা ও ইবনে সা'দ-এর মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

যাহোক, এর একটি ব্যাখ্যা তাবাকাতুল কুবরা'র একটি বর্ণনা অনুযায়ী কিছুটা এরূপ যে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলেন, কিন্তু যাত্রা করার পূর্বে তাকে কুকুরে কামড়ায়। এ কারণে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ (প্রত্যক্ষ যুদ্ধে) অংশগ্রহণ না করলেও তিনি এর আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দকে বদরের যুদ্ধের গণিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে অংশ প্রদান করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) উহুদ ও পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। *[আল ইস্তিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৪, সা'দ বিন উবাদা, দারুল জিল, ১৯৯২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত] [আত্তাবাকুতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬১, সা'দ বিন উবাদা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯০ সনে মুদ্রিত] [সীরাতুস সাহাবা (রা.) সা'দ বিন উবাদা, দারুল ইশাআত, ২০০৪ সনে করাচীতে মুদ্রিত]*

একটি রেওয়ায়েত এরূপও রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর কাছে ছিল। এটি আল্ মুস্তাদরেক-এর রেওয়ায়েত। *[আল মুস্তাদরেক আলাস সহীহায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২, কিতাবু মা'রেফাতুস সাহাবা, বাব মুনাকেব সা'দ বিন উবাদা, হাদীস নম্বর ৫০৯৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ২০০২ সনে মুদ্রিত]*

বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-কে 'আযব' নামক তরবারি উপহারস্বরূপ প্রদান করেন আর মহানবী (সা.) এই তরবারি নিয়েই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। *[সাবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮, বাবু গাযওয়াতি বাদরিল কুবরা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ মহানবী (সা.)-কে উপহারস্বরূপ একটি গাধাও প্রদান করেছিলেন। *[সাবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬, আল বাবুর রাবে' ফি বাগালেহি ও হামিরিহি (সা.), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

মহানবী (সা.)-এর কাছে সাতটি বর্ম ছিল। সেগুলোর একটির নাম ছিল 'যাতুল ফুযুল'। সেটির দৈর্ঘ্যের জন্য এই নাম দেয়া হয়েছিল। আর এই বর্মটি হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে তখন প্রেরণ করেছিলেন যখন তিনি (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এই বর্মটি লৌহ নির্মিত ছিল। এটিই সেই বর্ম ছিল যা মহানবী (সা.) আবু শাহ্‌ম নামক ইহুদির কাছে যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। আর যবের পরিমাণ ছিল ত্রিশ সা' এবং তা এক বছর সময়ের জন্য ঋণ হিসেবে নেয়া হয়েছিল। *[সাবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮, আল বাবুর রাবে' ফি দরুয়েহি ওয়া মাগফিরেহি ওয়া বায়যেহি ... দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে থাকত আর আনসারদের পতাকা থাকত হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর কাছে। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) আনসারদের পতাকাতলে থাকতেন। *[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১৭, মুসনাদ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

অর্থাৎ শত্রুদের প্রবল ও তীব্র আক্রমণ আনসারদের ওপর হতো, কেননা, মহানবী (সা.) সেখানেই থাকতেন।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একটি গাধার ওপর আরোহণ করেন যার ওপর ফাদাক নির্মিত ছোট কম্বল বিছানো ছিল এবং তিনি হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)কে নিজের পিছনে বসিয়ে নেন। তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। কেননা, সেসময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি বনু হারেস বিন খাযরাজের মহল্লায় ছিলেন। এই ঘটনা বদরের যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। হযরত উসামা বলতেন, পথ চলতে চলতে তিনি (সা.) এমন একটি বৈঠকের পাশ দিয়ে যান, যাতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলও ছিল। এটি তখনকার ঘটনা যখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল মুসলমান হয় নি, আর এটি সেই একই ঘটনা যাতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই সলূল মহানবী (সা.)-এর সাথে চরম বেয়াদবি বা অশিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিল। যাহোক, তিনি (সা.) যখন নিজ বাহনে বসে যাচ্ছিলেন তখন ধূলা উড়ে সেই বৈঠকের ওপর গিয়ে পড়ে, তারা হয়ত রাস্তার পাশে বসেছিল। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল তার চাদর দিয়ে নিজের নাক ঢাকে এবং বলে, আমাদের ওপর ধূলা উড়িও না। মহানবী (সা.) তাদেরকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলেন এবং থামেন। সে যখন এই কথা বলে তখন মহানবী (সা.) নিজের বাহন দাঁড় করান এবং 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলেন আর গাধার ওপর থেকে নামেন। তিনি (সা.) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বলে, ওহে! তুমি যে কথা বলছ এর চেয়ে ভালো কোন কথা হয় না? এটিই যদি তোমার বক্তব্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বৈঠকে এসে (এমন কথা শুনিয়ে আমাদের) কষ্ট দিও না। এসব কথা বলার জন্য আমাদের বৈঠকে আসার কোন প্রয়োজন নেই আর (এই ঘটনা পূর্বেও আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।) নিজ গৃহে ফিরে যাও আর যে তোমার কাছে আসে তাকে শুনাও। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পূর্বেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং সাহাবী ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের বৈঠকে এসেই আপনি আমাদের পাঠ করে শোনান, আমরা এটি পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদিরা পরস্পরকে বকাঝকা আরম্ভ করে। তারা পরস্পরের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অবশেষে তারা বিরত হয়। এরপর মহানবী (সা.) নিজ পশু অর্থাৎ বাহনে বসে চলে যান। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌র কাছে যান। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, সা'দ! তুমি কি শুনেছ আবু হুবাব কী বলেছে? তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে বুঝাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমাকে এই এই কথা বলেছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি একে ক্ষমা করে দিন এবং উপেক্ষা করুন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এখন আল্লাহ্ তা'লা সেই সত্য এখানে নিয়ে এসেছেন যা তিনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এখানকার অধিবাসীরা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা যখন আপনাকে প্রদত্ত সত্যের কারণে এটি পছন্দ করেন নি তখন সে বিদ্বেষের অনলে পুড়তে থাকে আর একারণে সে এমনটি করেছে, যা আপনি দেখেছেন। অর্থাৎ সে নেতা হতে যাচ্ছিল কিন্তু আপনার আগমনে তার নেতৃত্ব খর্ব হয়। তাই সে আপনার প্রতি বিদ্বেষ এবং হিংসা পোষণ করে সেসব কথা বলেছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) তাকে উপেক্ষা করেন। তিনি (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের উপেক্ষা করতেন আর তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করতেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

لَتُبْلَوُنَّ فِيْۤ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۟ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

(সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে তাদের পক্ষ থেকে তোমরা অবশ্যই অনেক মর্মপীড়াদায়ক কথা শুনবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করলে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করলে নিশ্চয়ই তা হবে সাহসিকতার কাজ।

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন,

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(সূরা আল বাকারা: ১১০)

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্য থেকে অনেকেই তাদের কাছে সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষের কারণে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদের কাফিররূপে ফিরিয়ে নিতে চায়! তাই তুমি (তাদের সম্পর্কে) আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত (তাদের) মার্জনা কর এবং তাদেরকে উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ক্ষমা করাকেই মহানবী (সা.) সর্বোত্তম মনে করতেন, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্

তা'লার নির্দেশে মহানবী (সা.) বদরের প্রান্তরে কাফিরদের মোকাবিলা করেন এবং এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা কাফির কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের ভবলীলা সাঙ্গ করেন। এ চিত্র দেখে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলসহ তার সঙ্গে থাকা মুশরিক ও মূর্তিপূজারীরা বলতে থাকে, এখন তো এই জামা'ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কাফিরদের এই পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মে এবং তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ইসলাম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে বয়আত করে মুসলমান হয়ে যায়। *[সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীর আলে ইমরান, হাদীস নং ৭৫৪৪]*

বদরের প্রান্তরে মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) যে কথা বলেছিলেন সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে আর তা হল- হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের আসার সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) পরামর্শ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রথমে হযরত আবুবকর (রা.) কথা বলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তার কথা উপেক্ষা করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) কথা বলেন অর্থাৎ পরামর্শ দিতে চাইলে মহানবী (সা.) তাকেও উপেক্ষা করেন। অতঃপর হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন আর আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদেরকে ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তাহলে আমরা তা-ই করব। আপনি যদি আমাদের 'বারকু গিমাদ' (এটি ইয়ামেনের একটি শহরের নাম যা মক্কা থেকে পাঁচ রাতের দূরত্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত) পর্যন্ত গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বলেন তবে আমরা অবশ্যই তা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) সবাইকে ডাকেন এবং যাত্রা করেন আর বদরের প্রান্তরে গিয়ে অবতরণ করেন। অর্থাৎ এ কথা শুনে মহানবী (সা.) তাঁর সাথিদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে বদরের প্রান্তরে পৌঁছেন। সেখানে কুরাইশদের পানি সংগ্রহকারীরা আসে এবং তাদের মাঝে বনু হাজ্জাজ গোত্রের কৃষ্ণাঙ্গ এক যুবকও ছিল। তারা তাকে পাকড়াও করে, অর্থাৎ মুসলমানরা তাকে ধরে ফেলে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তার কাছে আবু সুফিয়ান ও তার সাথিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকে। কেননা প্রথমে এটিই জানা গিয়েছিল যে, আবু সুফিয়ান তার এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছে। যাহোক উত্তরে সে এ কথাই বলতে থাকে যে, আমি আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে কিছুই জানি না কিন্তু আবু জাহল এবং উতবা ও শায়বা আর উমাইয়া বিন খালফরা নিশ্চিতভাবে সেখানে বসে আছে। যখন সে একথা বলে তখন তারা তাকে মারধর করে। এতে সে বলে, ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে বলছি, আবু সুফিয়ানও তাদের মাঝে রয়েছে। তারা যখন তাকে ছেড়ে দেয় এবং পুনরায় জিজ্ঞেস করে তখন সে বলে, আবু সুফিয়ানের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই তবে আবু জাহল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়া বিন খালফ তাদের মাঝে উপস্থিত আছে। অর্থাৎ বদরের প্রান্তরে যে সেনাদল এসেছে এবং অবস্থান করছে তাদের মাঝে এরা রয়েছে, কিন্তু আবু সুফিয়ান নেই। যখন সে একথা বলে, তখন তারা তাকে পুনরায় প্রহার করে। মহানবী (সা.) সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি (সা.) এরূপ অবস্থা দেখে সালাম ফিরান এবং বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সে যখন তোমাদেরকে সত্য বলে তখন তোমরা তাকে প্রহার কর, আর সে যখন তোমাদের মিথ্যা বলে, তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, এই ছেলে যা বলছে, ঠিক বলছে। এরপর তিনি (সা.)-এর বলেন, এটি অমুকের লাশ পড়ার স্থান। অর্থাৎ সেই শত্রুদের নাম উল্লেখ করে বলেন যে, বদরের প্রান্তরের এখানে অমুকের লাশ পড়ে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) মাটিতে নিজের হাত রেখে বলছিলেন, এই এই স্থানে (অমুক নিহত হবে)। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে একজনও নিজের স্থান থেকে এদিক সেদিক হয় নি অর্থাৎ শত্রু যারা ছিল তারা সেখানেই পড়ে নিহত হয় যেস্থানটি মহানবী (সা.) হাত দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। *[সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ] [ফারহাঙ্গে সীরাত সাহাবা, পৃ. ৫৭, ২০০৩ সনে করাচিতে মুদ্রিত]*

উহুদের যুদ্ধের পূর্বে এক শুক্রবার সন্ধ্যায় হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মসজিদে নববীতে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর দ্বারে সকাল পর্যন্ত পাহারা দিতে থাকেন। মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন, ধনুক কাঁধে নেন এবং হাতে বর্শা ধারণ করেন তখন উভয় সা'দ, অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) উভয়ে তাঁর (সা.) সম্মুখে দৌড়াতে থাকেন। এ উভয় সাহাবী বর্ম পরিহিত ছিলেন আর অন্যরা মহানবী (সা.)-এর ডানে এবং বামে ছিলেন। *[আত তাবকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮-৩০, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উহুদের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

"মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি বড় দলের সাথে আসরের নামাযের পর মদীনা থেকে রওয়ানা হন। অওস এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) তাঁর বাহনের সামনে ধীরে ধীরে দৌড়াচ্ছিলেন আর অন্য সাহাবীরা তাঁর (সা.) ডানে, বামে এবং পেছনে হাঁটছিলেন।" *[হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম এ সাহেব রচিত সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃ. ৪৮৬]*

উহুদের যুদ্ধের সময় যেসব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর পাশে অবিচলতার সাথে দণ্ডায়মান ছিলেন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম। *[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৭, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন আর নিজের ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন তখন হযরত

সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর সহায়তায় তিনি (সা.) নিজ-গৃহে প্রবেশ করেন। *[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৯, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]* তিনি আহত ছিলেন, তাই এ অবস্থায় অবতরণের সময় এ দু'জনের সহায়তা নিয়েছেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধাভিযানে আমাদের মূল পাথেয় ছিল খেজুর। হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধাভিযান তৃতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কুরাইশ বাহিনী মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত রওহা নামক স্থানে অবস্থান নেয়। সেখানে কুরাইশদের এই ধারণা জন্মে যে, মুসলমানদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তাই ফিরে গিয়ে মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করা উচিত, যেহেতু মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তাই তারা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। অপরদিকে মহানবী (সা.) কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হন এবং হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি (সা.)-ও তাদের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত হন। তখন তিনি (সা.) বলেন, চলো, আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। হামরাউল আসাদ মদীনা থেকে 'যুল হুলায়ফা'র দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মহানবী (সা.)-এর এই আগমন সংবাদ জানার পর কুরাইশ বাহিনী মক্কা অভিমুখে পলায়ন করে। তারা যখন দেখল, মুসলমানরা দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে তখন তারা পালিয়ে যায়। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) তখন ৩০টি উট এবং অনেক খেজুর নিয়ে আসেন যা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। বর্ণনাকারী লিখেছেন, তিনি উটও নিয়ে এসেছিলেন যা কোন দিন ২টি আবার কোন দিন ৩টি করে জবাই করা হত। *[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১০, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত] [ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ. ১০৬, ২০০৩ সনে করাচিতে মুদ্রিত] [হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম এ সাহেব রচিত, সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃ. ৩৫৪] [শারহুয্ যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]* আর এগুলোর মাংসই খাওয়া হতো।

চতুর্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে বনু নযীর-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সেসময় মহানবী (সা.) ইহুদীদের বনু নযীর গোত্রের দূর্গগুলোকে ১৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে খায়বারের দিকে দেশান্তরিত করেছিলেন। এই ঘটনায় গণিমতের মাল অর্জিত হলে মহানবী (সা.) হযরত সাবেত বিন কায়েসকে ডেকে বললেন, তোমার জাতির লোকদের আমার কাছে ডেকে আন। হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) শুধু কি খাযরাজ গোত্রকে ডাকব? তিনি (সা.) বললেন, না, সকল আনসারকে ডাক। অতএব তিনি (রা.) অওস ও খাযরাজ গোত্রকে তাঁর (সা.) সমীপে ডেকে আনেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার যথাযথ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। অতঃপর তিনি (সা.) আনসারদের সেসব অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন যা তারা মুহাজিরদের প্রতি করেছেন। অর্থাৎ তোমরা কীভাবে মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করেছ অর্থাৎ তোমরা মুহাজিরদেরকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছ এবং তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছ। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা চাইলে আমি বনু নযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ অর্থাৎ সেই গণিমতের মাল যা কাফিরদের কাছ থেকে কোন যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানরা লাভ করেছে, তা আমি তোমাদের ও মুহাজেরদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দিব। এ অবস্থায় মুহাজেররা পূর্বের ন্যায় তোমাদের বাড়িতে ও সম্পদে অংশীদার থাকবে। অথবা তোমরা চাইলে এই সম্পদ আমি শুধু মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিব, অর্থাৎ অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করা হলে তোমরা যেভাবে পূর্বে তাদের অর্থাৎ মুহাজেরদের সাথে ব্যবহার করে আসছ সেভাবেই করতে থাকবে, তারা তোমাদের বাড়িতেই থাকবে, ভ্রাতৃত্ববন্ধনও বজায় থাকবে, যেভাবে এখন এই বন্ধন রয়েছে। কিন্তু তোমরা চাইলে এই সম্পদ আমি শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিব যার ফলে তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে, পুরো সম্পদ তারা লাভ করবে কিন্তু এরপর তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। পূর্বের নির্ধারিত অধিকার আর তাদের থাকবে না। এতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.) উভয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই সম্পদ মুহাজেরদের মাঝেই বণ্টন করে দিন আর তারা আমাদের বাড়িতে ঠিক সেভাবেই থাকুক যেভাবে পূর্বে ছিল। আমাদের এই সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এই পুরো সম্পদ তাদের মাঝেই বিতরণ করে দিন, আনসারদের দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের যে অধিকার বলবত থাকবে, অর্থাৎ আনসার এবং মুহাজিরদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে উঠেছে, আমাদের বাড়িতে তাদের যাতায়াত করার এবং অবস্থান করার যে অধিকার রয়েছে তা পূর্বের মতই বহাল থাকবে। আনসাররা সমস্বরে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা এতে সম্মত আর আমাদের জন্য এটি শিরোধার্য। এতে মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আনসার এবং আনসারদের ছেলেদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর।

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে 'ফ্যায়'-এর যে সম্পদ দান করেছেন তা তিনি মুহাজেরদের মাঝে বিতরণ করেন এবং আনসারদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবী ব্যতীত অন্য কাউকে কিছুই দেন নি। উক্ত দু'জন আনসার সাহাবী অভাবগ্রস্ত ছিলেন। তারা দু'জন হলেন, হযরত সাহল বিন হুনায়েফ এবং হযরত আবু দজানা (রা.)। এছাড়া তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে ইবনে আবু হুকায়েকের তরবারি প্রদান করেন। *[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৫, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত] [এটলাস সীরাতে নববী, পৃ. ২৬৪-২৬৫, ১৪২৪ হিজরী সনে মুদ্রিত] [উমদাতুল কারী শারহ্ সাহীহ্ বুখারী, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২০৪, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

হযরত সা'দ (রা.)'র মাতা হযরত আমরা বিনতে মাসঊদ (রা.), যিনি মহিলা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, মহানবী (সা.) যখন দুমাতুল

জান্দাল-এর যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন সেসময় তার মৃত্যু হয়েছিল। পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। হযরত সা'দ (রা.) এই যুদ্ধে তাঁর (সা.) সঙ্গে একই বাহনে ছিলেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মদীনার বাহিরে থাকাকালীন সময়ে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর মায়ের ইন্তেকাল হয়েছিল। সা'দ (রা.) নিবেদন করেন, আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে আর আমি চাই, আপনি তার জানাযার নামায পড়ান। যদিও তার মৃত্যুর তখন একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ একমাস পরে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে তার মায়ের পক্ষ থেকে একটি মানতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যা তিনি পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ কর। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, তিনি ওসিয়্যত করেন নি, আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা দেই তাহলে তা কি তার কোন উপকারে আসবে? মহানবী (সা.) বললেন, অবশ্যই। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, কোন্ ধরনের সদকা আপনার অধিক পছন্দ? তিনি (সা.) বললেন, তুমি পানি পান করাও। *[আত তাবাকাতুল কুবরা লে-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬১-৪৬২, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

মনে হয় সে সময় পানির সঙ্কট ছিল, পানির অনেক প্রয়োজন ছিল। যাহোক, এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, তখন হযরত সা'দ (রা.) একটি কূপ খনন করিয়ে বলেন যে, এটি উম্মে সা'দের পক্ষ থেকে উৎসর্গিত। অর্থাৎ তার নামে এটি চালু করেন।

আল্লামা আবু তাইয়্যেব শামসুল হক আযীমাবাদী আবু দাউদের ব্যাখ্যায় লিখেন- মহানবী (সা.) এই যে বলেছেন সবচেয়ে উত্তম সদকা হল পানি অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেছেন যে, পানি পান করাও। সে দিনগুলোতে পানির সঙ্কটই এর মূল কারণ ছিল। সার্বিকভাবে পানির প্রয়োজন সব জিনিসের তুলনায় সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এরপর আরো লিখেন, পানি সদকা করার কথা তিনি (সা.) শ্রেয় আখ্যা দিয়েছেন কেননা, এটি ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াদির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর জিনিস, বিশেষভাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে সেই অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন, وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا *(সূরা আল্ ফুরকান: ৪৯)* অর্থাৎ আমরা আকাশ থেকে পবিত্র পানি অবতীর্ণ করেছি। সেখানে অর্থাৎ মদিনাতে পানিই সবচেয়ে মূলবান ছিল। গরমের তীব্রতার কারণে স্বাভাবিক পানির প্রয়োজন এবং পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে পানিকে অনেক মূল্যবান জিনিস মনে করা হত। *[আওনুল মা'বূদ শারহ্ আবী দাউদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬ কিতাবুয যাকাত, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত]*

অবশ্য পানিকে আজও মূল্যবান মনে করা হয়। এর জন্য বা এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকারও বলতে থাকে। আর এ দিকে দৃষ্টিও দেয়া উচিৎ। যাহোক, শুধুমাত্র পানির কূপ খনন করিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি; হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.), যিনি বনু সায়েদার সদস্য ছিলেন, তার মা মারা যাওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন আর সে সময় আমি তার নিকট উপস্থিত ছিলাম না। হয়তো তিনি ফিরে আসার পর জেনে থাকবেন। প্রথমে সম্ভবত আমি বলে দিয়েছিলাম সফরের সময় জেনেছেন যাহোক, সফরেই জেনে থাকুন বা ফিরে আসার পর অবগত হোন মোটকথা তিনি সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে নিবেদন করেন, আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই আমি তার পক্ষ থেকে কিছু সদকা করলে তাতে কি তার কল্যাণ হবে? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, মিখরাফ নামে আমার একটি বাগান রয়েছে তা আমি তার পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ দিচ্ছি। *[সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ওয়াসায়া, হাদীস নম্বর-২৭৬২]*

তিনি সদকা-খয়রাত এবং দরিদ্রদের সাহায্যের ক্ষেত্রে খুবই উদার-মনা ছিলেন আর অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তার স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে আর তা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। *[আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ জানুয়ারি ২০২০ পৃ. ৫-৯]*

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

Dr. Nazifa's Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges

Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital–DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy–Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

ঈদুল ফিতরের খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক

নাম-সর্বস্ব মৌলবীরা আশা করুক আর না-ই করুক ইসলামের সজীবতার যুগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর (আ.) জামা'তের সাথে সুসংবদ্ধ

পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে

যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে

তাশাহ্হুদ, তাঊজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন-

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

(আল-ইনশেরাহ:৬-৭)

অর্থ: অতএব (জেনে রাখ) নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। আমি যে আয়াত দুটি পাঠ করলাম এগুলো সূরা আল-ইনশেরাহ্ এর। অনেকেরই এটি মুখস্ত আছে। এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা সবাই জানি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দীর্ঘ তের বছর অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। দরিদ্র সাহাবীদের উপর যে নির্যাতন চলত তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে সর্বদা ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। হযরত ইয়াসের (রা.) ও তার পরিবারের উপর নির্যাতনের এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের উপর নির্যাতন চলছিল, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ নির্যাতন দেখে বললেন, **"সাবরান আ-লা ইয়াসের ফাইন্না মাওয়েদাকুমুল জান্নাত"** (মুসতাদরেক, খণ্ড-৪, কিতাব-মা'রেফাতুস্ সাহাবাহ্ যিকরু মানাকেবে আম্মার বিন ইয়াসের পৃ-৯৯, হাদীস-৫৭৩২) অর্থাৎ হে ইয়াসেরের পরিবার! ধৈর্য ধারণ কর। এসব কষ্টের বিনিময়ে খোদা তা'লা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করছেন বা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এরপর এ নির্যাতনের মধ্যেই এ দু'জন স্বামী-স্ত্রী শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। লক্ষ্য করুন, নির্যাতন এত তীব্র ছিল যে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু এ থেকে মুক্তি দিতে পারত না। মুক্তির কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। অন্যদিকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ সুসংবাদও দেয়া হচ্ছিল যে, 'সব দুঃখ-কষ্টের পরই এক মহা সাফল্য নির্ধারিত আছে। এবং নিশ্চয় সব দুঃখ-কষ্টের পর আরেকটি বিজয় নির্ধারিত আছে।' দুঃখ-কষ্ট, প্রাণের কুরবানী এবং নির্যাতনের সংকটময় এ অবস্থা তো আছে। কিন্তু এই এক একটি নির্যাতনের বিপরীতে বিজয়ের একটি ধারা আরম্ভ হবে। এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে, এসব দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতীতগণ শুধু সমগ্র আরবেই বিজয়ী হয় নি, বরং আরবের গণ্ডি পেরিয়ে বড় বড় রাজত্বকে পরাজিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কর্তৃত্বে নিয়ে আসে এবং

মাধ্যমে দলিল পেশ করত যে কষ্টের এ শতাব্দীর বিপরীতে চতুর্দশ শতাব্দী আসবে স্বাচ্ছন্দ্যের। কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে চতুর্দশ শতাব্দী যখন এসে গেল এবং শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীদার এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তার সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হল। পৃথিবী ও আকাশ তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিল, তখন এসব আলেমগণই সর্বপ্রথম তাঁকে অস্বীকার করল।" (তোহফায়ে গোলড়বিয়া, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩২৭, পাদটীকা)

অতএব, আলেমদের আচরণ ও রীতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। এখন তারা এটিও বলতে শুরু করেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আসার প্রয়োজনই নেই। নেতা রূপে আমরাই যথেষ্ট অর্থাৎ এসব নামধারী ওলামা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাকে পথ-প্রদর্শক বানান সে-ই প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। স্বঘোষিত পথ-প্রদর্শকগণ প্রকৃত পথ-প্রদর্শক নয়। নয়তো যাদের শুধু পার্থিব জ্ঞান রয়েছে, তাদের অজ্ঞতা প্রসূত কথা-বার্তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে এতে ঐশী নেতৃত্বের নূরের ছিটে ফোটাও নেই। সম্প্রতি একটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। একজন বড় স্কলার (বিজ্ঞ ব্যক্তি) বলে কথিত যার ডক্টরেট ডিগ্রীও রয়েছে এবং তাকে ডক্টর-ই বলা হয়।

তিনি পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী এবং ইসলামী চিন্তাধারা কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। তার সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ এসেছে। তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ওবামা যদি গ্রাউণ্ড জিরোতে মুসলমানদের সাথে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন, কেননা বর্তমানে গ্রাউণ্ড জিরোর যে controversy রয়েছে, যে বড় সমস্যা চলছে, তবে মুসলিম উম্মাহ্ তাকে খলীফাতুল মুসলেমীন এবং আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মেনে নিবে। যে চিন্তা করে বা যে হিসাব বা অংক কষেই তিনি এ বিবৃতি দিয়ে থাকুন, তার বুদ্ধি বিবেচনায় আশ্চর্য্য হতে হয়। এসব মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টির এ-কী হাল? এসব মুমিনদের 'খলীফাতুল মুসলেমীন' এমনই হওয়া প্রয়োজন। আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুসলেমীনের জন্য তারা এটি, কি মানদণ্ড নির্ধারন করেছে? কোন ধরনের মানদণ্ডের ভিত্তিতে তারা তা বানাতে চায়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে না মানার কারণে তাদের চোখও প্রত্যেক বিষয় পার্থিব দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে । এ কথার মাধ্যমে অনুমান করা যায়, অন্ধকার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরপরও তারা বলে, আমাদের এখন কোন মসীহ্ ও মাহ্দীর প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর দয়া করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,'ইসলাম বড় বড় বিপদের দিন অতিক্রম করেছে। এখন এর হেমন্ত পার হয়ে বসন্তকাল চলছে। 'ইন্না মাআল উসরে ইউসরা' অর্থাৎ কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিন্তু মোল্লাগণ চায় না যে এখন ইসলাম পুনরায় সজীব ও প্রাণবন্ত হোক।' (মলফুযাত, খণ্ড-৫, পৃ-১৬৫)

অতএব, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে ইসলামের কষ্টের যুগ শেষ হয়েছে। যুগের মসীহ্ ইসলামের অতুলনীয় শিক্ষাকে উজ্জ্বলভাবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। অভ্যন্তরীণ ও বহির্শত্রুদের সৃষ্ট সর্ব প্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আহমদীয়াতের কাফেলা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হচ্ছেন। মুসলমানদের মধ্যেও সৎ প্রকৃতির লোকগণ যুগ ইমামের হাতে সমবেত হয়ে সেই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ধারন করছেন যা দল উপদলের বিভক্তি থেকে মুক্ত প্রথম যুগের মুসলমানগণ অবলম্বন করেছিলেন, যেটি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। এসব আহমদী মুসলমান সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছেন যার আমলী (বাস্তব) উদাহরণ সাহাবীগণ (রা.) আমাদের সামনে পেশ করেছিলেন। যারা অনেক কুরবানী করেছিলেন, প্রাণের কুরবানী পেশ করেছিলেন এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছিলেন। যারা ইবাদতের উচ্চমান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্দ্বিধায় সম্পদ কুরবানী করেছিলেন। যারা খোদা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর জন্য বন্দীত্বের কষ্ট বরণ করেছিলেন।

আজ শুধুমাত্র আহমদীগণই এ নমুনার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করছে। যারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা সমুন্নত করার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করতে কেবল প্রস্তুতই নয়, বরং করেও যাচ্ছেন। আমরা এ দৃষ্টান্ত ঐ সব মুসলমান রাষ্ট্রে দেখতে পাই যেখানে আহমদীয়াত বিরোধীরা ইসলামের নামে লোকদের হৃদয়ে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিষ ঢালছে। আবার কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যারা তাদের কিছু অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এসব দুস্কৃতিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কিন্তু এসব কষ্ট আহমদীদের ঐসব কুরবানীর কথা স্বরণ করিয়ে দেয় যা প্রথম যুগের মুসলমানগণ পেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগেও কষ্ট ছিল, আবার স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। বিশ্ববাসী এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছে। মদীনা এসেও সেই কষ্টের যুগ শেষ হয় নি। বিরোধিতা ও ফিতনা শেষ হয়ে যায় নি। মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রতারনা করে শহীদ করা হয়। বি'রে মাউনার বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে যখন ধোকা দিয়ে একটি গোত্র সত্তর জন হাফেজে কুরআনকে শহীদ করে। রজী নামে একটি ঘটনা বিখ্যাত। এতেও ধোকা দিয়ে দশ জন সাহাবীকে শহীদ করা হয়। বর্ণনা অনুযায়ী এ দুটি ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একই সময়ে জানতে পারেন। (শরহে আলামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুলাহ্, খণ্ড-২, পৃ-৪৭৬) এতে তিনি (সা.) খুবই দুঃখিত হন। (শরহে আলামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুলাহ্, খন্ড-২, পৃ-৫০৩)।

বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ত্রিশ দিন পর্যন্ত এসব যালেমদের বিরুদ্ধে ফজরের নামাযে দাড়িয়ে এ দোয়া করতেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি এ অবস্থায় আমাদের প্রতি করুণা কর এবং ইসলামের শত্রুদের হাত প্রতিহত কর যারা তোমার ধর্মকে ধ্বংসের জন্য নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্তপাত করে চলছে। (সীরাতে খাতামান্নাবিঈন, পৃ-৫২১) অতএব, কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ একই সাথে চলতে থাকে। একদিকে মুসলমানদের রক্ত বইতে থাকে, অন্যদিকে নবাগতদের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হতে থাকে। প্রত্যেক কষ্টের পর মুসলমানগণ একটি বড় বিজয় লাভ করতে থাকেন। এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) - এর সত্য প্রেমিকরূপে তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন এ প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছে। সব কষ্টের পর বিজয় অবধারিত হবার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দু'বার দিয়েছেন তা এজন্য যে, যে দৃশ্য প্রথম যুগের মুসলমানগণ দেখেছিলেন তা তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও প্রকাশিত হবে। নামধারী মৌলভীগণ প্রত্যাশা করুক

কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ বিশ্বের বুকে এক বৃহৎ শক্তি রূপে বিরাজমান থাকে। আজ মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্বে গর্ব অনুভব করে। নিঃসন্দেহে এটি গর্ব করারই যোগ্য। আজ ভূ-পৃষ্ঠে এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছুই নেই যে আমরা শেষ যুগের নবী এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাসদের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত যেমন ঘোষনা করে যে কষ্টের যুগও আসে। তাই কষ্টের যুগ আসবে এবং এসেছেও। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আমার উম্মতের উপর একটি অন্ধকার যুগ আসবে যখন তাদের সেই সম্মান, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না যা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ আমরা দেখছি, কত সুস্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তারা তাদের মর্যাদা ও গৌরব হারিয়ে বসেছে।

আজ তারা প্রতিটি জিনিষের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। আমাদের নিজেদের সম্পদও এখন অন্যের দখলে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা তেল উত্তোলন করতে বা কোন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হতে সক্ষম হতে পারছি না। এ হচ্ছে পার্থিব অবস্থা। আর ধর্মের অবস্থা কি? নামধারী আলেমগণ ধর্মকে বিকৃত করে এতে বিদাত (নতুনত্ব) সৃষ্টি করেছে। আজ সেই ইসলাম নেই যা রাসূলুলাহ (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই ইসলাম যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন এবং এ ইসলাম যা বর্তমান নামধারী আলেমগণ পেশ করছেন, এ উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। ঈমানের আবেগ অবশ্য প্রকাশ করা হয়, কিন্তু আমল (বাস্তবায়ন) থেকে তা বহু দূরে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে ইসলামের দুর্নাম করার চেষ্টা চলছে। কথিত জিহাদের অস্ত্রাদীর জন্যও মুসলমানগন আবার সেই অমুসলিমদেরই মুখাপেক্ষী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে এক স্থানে বলেছেন,'আল্লাহ্ তা'লা যদি এ যুগে অস্ত্রের জিহাদ বা যুদ্ধের অনুমতি দিতেন, তবে মুসলমানদেরকে অস্ত্রের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী করতেন না।' (মলফুযাত, খণ্ড-৩, পৃ-১৯০)

অতএব, বর্তমানে অমুসলিমগণ যেহেতু সাধারনত ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে না, তাই এখন যদি ধর্মের নামে অস্ত্র ধারন কর তবে পরাজিত হবে। শুধু তাই নয়, জিহাদ এবং ইসলামের নামে জিহাদের এমন অপব্যবহার করা হচ্ছে যে নির্যাতন ও বর্বরতার উপাখ্যান রচিত হচ্ছে। ইসলাম সেই অতুলনীয় ধর্ম যা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতিও শুধু এজন্য পেয়েছিল যে কাফেরদের যদি তখন প্রতিহত করা না হতো তবে কোন গির্জাও নিরাপদ থাকবে না। ইহুদীদের কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। অন্য কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। মসজিদ সমূহও নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু এরা এমন জিহাদী যারা খোদার নামে খোদারই ঘরে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাস রচনা করছে। নির্দ্বিধায় তারা কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করে চলেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যুদ্ধচলাকালীন সময়েও কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন নারীকে হত্যা করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না, পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ যারা নিজেদের উপাসনালয়ে ইবাদতে মগ্ন এবং উপদেশ দানরত, তাদের কোন ক্ষতি করবে না। জাতীয় সম্পদ, বৃক্ষ প্রভৃতি বিনষ্ট করবে না। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব-ফী দোয়াইল মুশরিকীন, হাদীস ২৬১৩-২৬১৪, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কিন্তু বর্তমান যুগের জিহাদীগণ তো স্বজাতি ও কলেমা পাঠকারী লোকদের সাথে এমন পাশবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করছে যা দর্শনে ও শ্রবনে শরীরের লোম দাড়িয়ে যায়। তাও আবার খোদা ও রাসূল (সা.)-এর নামে তারা এসব করছে। নিশ্চয় এহেন কর্মের জন্য তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি অর্জন করে ধৃত হবে এবং হচ্ছেও। কেবল জঙ্গী সংগঠনগুলোই নয় যাদের সাধারনত সর্বত্রই ধীক্কার জানানো হয়, বরং আহমদীদের উপর এ ধরনের নির্যাতন অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষভাবে আহমদী-বিরোধী আলেমগণও অনুমতি দিয়ে থাকে। শুধু আলেমগণই নয়, কিছু রাষ্ট্রও এ নির্যাতনের সাথে জড়িত। তারা অত্যাচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

এটা কি সেই কষ্টের যুগ, যে সম্পর্কে খোদা তা'লা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অবগত করেছিলেন যে আজ মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে, ক্ষমতা লাভের পর মুসলমানগণ নিজেরাই কাল নির্যাতন করায় লিপ্ত হবে? কক্ষনো নয়, কক্ষনো না। যেমন আমি বলেছি, সেই মক্কার যুগ কষ্টের ছিল যার পর আল্লাহ্ তা'লা স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। এর এক যুগ পর পুনরায় কষ্টের যুগ এসেছে, যার পর আল্লাহ্ তা'লা পুণরায় স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেই স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ ধর্মীয় উন্নতির ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের পর আরম্ভ হবার ছিল এবং সেটি হয়েছেও। কিন্তু যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করে নি তারা এখনো অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং মসীহ্ মাওউদকে মান্যকারীদের কষ্টে জর্জরিত করার চেষ্টা করছে। তারা দিনরাত এ চেষ্টায় লিপ্ত যে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যায়। উম্মতের জন্য এরচেয়ে বড় দুঃখজনক আর কি হতে পারে যে, যে অন্ধকার থেকে নিস্কৃতি এবং মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন, মুসলমানগণ সেই মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামা'তের উপর অত্যাচার চালিয়ে নিজেদের কষ্টের যুগ দীর্ঘায়িত করে চলেছে। আহমদীয়াত বিরোধীরা মনে করে যে তারা আহমদীদের কষ্টে নিপতিত করছে।

আহমদীদেরকে তো আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব কষ্টকর অবস্থার পর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে যাচ্ছেন। বিরোধীরা তাদের ধারণায় আহমদীয়াতকে ধ্বংস করার জন্য যেসব বিরোধীতা, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, এসব প্রতিটি বিরোধিতার পর জামাত উন্নতির উচ্চতর সিড়িতে পা রাখছে, আর বিরোধীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন ভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তবুও লোকেরা বুঝতে পারছে না এবং নামসর্বস্ব ধর্মীয় পোষাকধারীদের হাতের খেলনা হয়ে চলেছে। মুসলমান জনসাধারনের মধ্যে কেউই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'খোদা তা'লা আমাদের বিরোধী আলেমদের অবস্থার উপর করুণা করুন। তারা যেসব কাজ করছে তা ধর্মের জন্য ভাল নয়, বরং অত্যন্ত ভয়ানক। তারা সেই সময়কে ভুলে গেছে যখন তারা মিম্বরে চড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে একের পর এক ধীক্কার জানাত এজন্য যে, এ শতাব্দীতে ইসলামের ভীষন ক্ষতি হয়েছে। তারা কুরআনের আয়াত **"ফা ইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা"** পাঠ করে এর

বা না করুক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের জন্য ইসলামের জীবন্ত ও সতেজতার যুগ নির্ধারিত আছে। শত্রুদের পক্ষ থেকে কষ্ট যেমন দেয়া হচ্ছে, তেমনি বিজয়ও পূর্বের চাইতে অধিক মর্যাদায় প্রকাশিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথেও আল্লাহ্ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলহামের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যখন তিনি বয়আত নেয়া শুরু করেন নি, এমনকি মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীও করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তখন তাকে বলেছেন, বা'দাল উসরে ইউসরা অর্থাৎ কষ্টতো আছে কিন্তু তা অল্প, এরপর স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয় নির্ধারিত আছে। ব্যাখ্যামূলক এ অনুবাদ আমি এজন্য করেছি যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, আরবী ভাষাবিদদের মতে **'আল-উসর'** শব্দ ব্যবহার করে কষ্টকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং **'ইউসর'** কে এ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রেখে প্রশস্ততা দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট রয়েছে, কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেক কাঠিন্য, প্রত্যেক কষ্ট অগনিত বিজয় নিয়ে আসবে এবং এটিই ঐশী জামা'তের বৈশিষ্ট্য। এ দ্বীনকে আল্লাহ্ তা'লা কেয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার সব নিদর্শনও আমরা পূর্ণ হতে দেখছি। ক্রমাগত উন্নতিও হচ্ছে। তবে আমরা এ বিষয়ে কেন দৃঢ় বিশ্বাসী হব না যে বিরোধী ও আলেমগণের বিরোধিতা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যক্তি-বিশেষের প্রাণ কুরবানীর ফলে জাতি ধ্বংস হয় না, বরং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে যখন কুরবানী করার অঙ্গীকার করা হয় এবং প্রাণ কুরবান করা হয়, তখন তা জাতি ও জামা'তের আয়ু দীর্ঘায়িত করে। তার শক্তি বৃদ্ধি করে। আর খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি যখন এসব কুরবানী এবং দৃঢ় সংকল্পকে উজ্জ্বলতর করে ঈমানকে দৃঢ় করতে থাকে, তখন কুরবানী ও কষ্ট সমূহ একেবারেই নগন্য মনে হয় এবং এক নতুন মর্যাদার সাথে উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কেও আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাবীর বহু পূর্বেই খোদা তা'লা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সান্ত্বনা দিতে থেকেছেন যে আমি তোমাকে যে কাজের উদ্দেশ্যে দাঁড় করাচ্ছি, তা যত কঠিন কাজই হোক, আমি তোমার সাথে আছি এবং তুমি সাফল্য ও বিজয় দেখতে পাবে। একবার এ আয়াতের মাধ্যমে ইলহামরূপেও তাঁকে বলেন, **"ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম্ মুবীনা লেইয়াগফিরা লাকালাহু মা তাকাদ্দামা মিন যাম্‌বেকা ওয়ামা তাআখ্‌খারা।"** বারাহীনে আহমদীয়াতে এর ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, অর্থাৎ দান করব এবং মাঝে যেসব কষ্ট কাঠিন্য ও বিপদাবলী রয়েছে, সেগুলো এ উদ্দেশ্যে যেন খোদা তা'লা তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এবিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান, তিনি চাইলে কোন ধরনের দুঃখ কষ্ট ছাড়াই মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যেত এবং খুব সহজেই মহা বিজয় লাভ হত। কিন্তু দুঃখ কষ্ট এজন্য যে এগুলো উন্নতি এবং গুনাহ্ সমূহ ক্ষমার উপায় স্বরূপ।

তিনি (আ.) আরো বলেন,'আজ এ প্রেক্ষিতে এ অধম যখন শুদ্ধকরনের উদ্দেশ্যে খাতা দেখছিলাম (যখন বারাহীনে আহমদীয়া লিখছিলেন) তখন কাশ্‌ফী অবস্থায় কয়েকটি পৃষ্ঠা আমার হাতে দেয়া হয় এবং তাতে লেখা ছিল, **'বিজয়ের ডঙ্কা বাজে'**। এরপর একজন মৃদু হেসে সেই পৃষ্ঠাগুলোর বিপরীত দিকে একটি ছবি দেখিয়ে বলল, দেখ তোমার ছবি কি বলে। আমি দেখলাম, সেটি এ অধমের ছবি। ছবিতে অধমের পোষাক ছিল সবুজ এবং অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় খুব প্রতাপশালী লাগছিল। ছবির ডান ও বাম দিকে **"হুজ্জাতুলাহুল কাদির ওয়া সুলতান আহমদ মুখতার"** লেখা ছিল।' (বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১, পৃ-৬১৫)

অতএব, এ সুসংবাদের আলোকে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে আহমদীয়াত বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমাদের যেসব কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হয় বা অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, এগুলোর দ্বারা জামা'তে আহমদীয়ার কোন ক্ষতি হবে না। শত্রুদের ষড়যন্ত্র সমূহ ব্যর্থ হওয়া, তারা যে লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা অর্জিত না হওয়া, এটি বিজয়ের চিহ্ন এবং বিজয়ের দিকে ধাবিত হবার লক্ষণাবলী প্রদর্শন করছে। কিন্তু বিজয়ের ডঙ্কা কি? সেটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এক মহা বিজয় হবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী সেটি দর্শন করবে। সেটি বাজবে, অবশ্যই বাজবে। শত্রুরা, যারা সময়ে সময়ে আহমদীদের কষ্ট দেয়, তা মিশরেই হোক বা ইন্দোনেশিয়াতে, মালেয়শিয়াতে হোক বা শ্রীলঙ্কাতে, হিন্দুস্তানে হোক বা বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে। সম্প্রতি বাংলাদেশে আমাদের একটি ছোট জামাত যা বহু দূরের একটি উপজেলায় অবস্থিত, যার নাম চাঁনতারা, সেখানে মসজিদ সম্প্রসারণের কাজ চলছিল।

মসজিদ নির্মান চলাকালীন সময়ে এসব দাঙ্গাবাজ যাদের মধ্যে মৌলভীরাও ছিল, আক্রমন চালিয়ে লোকজনদের শুধু আহতই করে নি, বরং মসজিদও ভেঙে ফেলেছে। আহমদীদের ঘরবাড়ীও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তারা এসব দরিদ্রদের জিনিষপত্র জ্বালিয়ে দেয়। পুরুষদের গুরুতর আহত করে। জামাতী কেন্দ্র ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধি যখন সেখানে যায় এবং নারীদেরকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করে, নারীরা সাধারণত দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু এক নারী হেসে বলে, এরা আমাদের যতই ক্ষতি করুক, আমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এ নারী এ কষ্টে কেঁদেও ছিল যে আমরা এখন মসজিদ নির্মাণ করতে পারব না। আমাদের কাজ কিছুটা থেমে গেছে। আর পাকিস্তানে তো নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ঐ ইহিতাস রচিত হচ্ছে যে মনে হয় এদের খোদা তা'লার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি সামান্যতম বিশ্বাসও নেই। যদি বিশ্বাস থাকত তবে খোদা তা'লার নামে এ নির্যাতন অব্যাহত রাখত না। গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত নিরানব্বই জনকে শহীদ করা হয়েছে। যালেমরা তো একদিনেই ছিয়াশি জনকে শহীদ করেছে। এসব যালেমদের দৃষ্টিতে আহমদীদের রক্ত এতই সস্তা যেন এর কোন মূল্যই নেই। তাদের ধারণায় নাউযুবিল্লাহ্ খোদা তা'লাও এ রক্তপাতের ব্যাপারে উদাসীন।

কিন্তু এসব রক্তপাতকারীদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'লা এসব যালেমদের কাছ থেকে রক্তের প্রতিটি বিন্দুর হিসাব নিবেন, অবশ্যই নিবেন। এবং এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু কবুল করে এমন ভাবে পুরস্কৃত

করবেন এবং পুরস্কৃত করেও যাচ্ছেন যে এটি আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **'ফাতহাম্ মুবীনা'** অর্থাৎ মহা বিজয়ের নিকটতর করছে। লাহোরের ঘটনার পর বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে, পরিচিতি হয়তো পূর্বেও ছিল কিন্তু দৃষ্টি ছিল না, জামা'তের প্রতি যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি আকর্ষন ও পরিচিতির জন্য আমরা যদি পূর্বে আমাদের উপকরণাদীর মাধ্যমে চেষ্টা করতাম, তবে সম্ভবত কয়েক দশক লেগে যেত। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ শহীদগণ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে কেবল পরজগতে চিরজীবন লাভ করেন নি, বরং তাদের প্রাণ কুরবানী করে এ জগতেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর মাধ্যম হয়ে গেছেন। বাণীতো আল্লাহ্ তা'লা পৌঁছাবেন। পৌঁছিয়ে যাচ্ছেন এবং পৌঁছিয়ে যাবেন। কিন্তু মাধ্যম আল্লাহ্ তা'লা বানান। এসব শহীদগণকে এ বাণী পৌঁছানোর একটি খুব শক্তিশালী মাধ্যম বানিয়েছেন তিঁনি। অতএব, এসব কুরবানীকারীগণ খুব সৌভাগ্যবান।

সম্প্রতি পাকিস্তানে কয়েক ডজন অ-আহমদী এবং অন্য ধর্মাবলম্বী লোক সন্ত্রাসীদের যুলুমের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক নিষ্পাপ প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, শিশুরা এতীম হচ্ছে, নারীরা বিধবা হচ্ছে, বৃদ্ধ পিতামাতা যুবক সন্তানদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু এসব নিহতরা জানেনা যে কেন তাদের হত্যা করা হয়েছে? তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও জানেনা যে আমাদের প্রিয়দের কেন হত্যা করা হয়েছে এবং কেন হত্যা করা হচ্ছে? কিন্তু পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে।

শহীদদের পরিবারবর্গ, সন্তান, বিধবা স্ত্রীগণ, পিতামাতাগণ জানেন যে আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী দিয়েছেন তা এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। প্রাণের কুরবানী পেশ করে তারা যেমন তাদের প্রাণ চিরস্থায়ী করে নিয়েছেন, তেমনি তারা পেছনে যাদের রেখে গেছেন তাদের মাথা গর্বে উঁচু করে গেছেন। এ বিষয়ে আমার কাছে বেশ কিছু চিঠি এসেছে, আসে এবং প্রায়ই আসছে। তারা লিখেছেন, আমরা তো জানতামই না যে আমাদের প্রিয়গণ আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের মর্যাদা কত বাড়িয়ে গেছে। এটি তো ব্যক্তিগত লাভ, কিন্তু জামা'তের যে লাভ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে ইনশাআল্লাহ্, তন্মধ্যে আহমদীদের ঈমানী দৃঢ়তা লাভও অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়েও আমার কাছে কিছু চিঠি আসে যে এ কুরবানী সমূহের মাধ্যমে আমাদের ভয় দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের আকাংখা সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে যেসব শিথিলতা ছিল সেগুলো দূর করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, জামা'তের তবলীগের ক্ষেত্র আরো উন্মুক্ত হয়েছে।

অতএব, **যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে।** আহমদীদের এ কষ্টকর অবস্থা বলে দিচ্ছে যে এখন 'উসর' অর্থাৎ কষ্টের সময়। যার বিনিময়ে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ইউসর' অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি হওয়া নির্ধারিত আছে। তার মধ্যে এ কুরবানী সমূহ উজ্জ্বল এক অধ্যায় বলে গণ্য হবে।

ইনশাআল্লাহ্ এ মহা বিজয়ের ডঙ্কা বাজবে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **ভবিষ্যতে যখন আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামের বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করা হবে বা বিজয় লাভের আনন্দ উৎসব পালন কালে আহমদী শহীদগণের স্মৃতিকে ইতিহাস সর্বদা জাগরুক রাখবে। বিশ্ববাসীকে বলা হবে, আজ তোমরা যে বিজয়ের আনন্দ বা ঈদ উদযাপন করছ তা ঐসব কুরবানীর বিনিময় স্বরূপ যা শহীদগণ তাদের রক্ত দিয়ে প্রদান করেছেন। শত্রুরা আহমদীদের রক্ত সস্তা মনে করে । এ রক্ত তো প্রতিদিন তার মূল্য বাড়িয়েই চলছে।**

ইসলামের প্রথম যুগের শহীদদের কুরবানী সমূহকে ইতিহাস আজও ভূলে নি, তবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টাকারীদের কুরবানী সমূহকেও ইতিহাস কখনো ভুলবে না। অতএব, শহীদদের স্ত্রী সন্তান, পিতামাতা, ভাইবোন বরং আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঈদ উদযাপন করা জরুরী। তারা যুগ ইমামের চিন্তা দূর করে তাদের রক্ত দান করে জামা'তের ইতিহাস রচনা করেছেন, তেমনিভাবে আমাদেরকে ঈদ উদযাপনের নতুন পন্থাও শিখিয়ে গেছেন।

কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে আত্মার পবিত্রতার জন্য যেখানে আমরা রমযানে বৈধ জিনিষগুলো কুরবানী করি, আর এর পর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ঈদ উদযাপন করি, সেখানে আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা রমযানে নিজেদের প্রাণ কুরবানী করে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারীতে পরিণত হয়েছে এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মর্যাদা লাভ করেছে। যদিও যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের জন্য এটি খুব কষ্টদায়ক। আপনজনদের বিচ্ছেদের দুঃখ তো ভুলা যায় না। যখন কোন আনন্দের উপলক্ষ্য আসে, যখন ঈদ আসে, তখন এ মর্ম-পীড়া আরো বেশী জাগ্রত হয়।

গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত এ বছরে ৯৭ জন শহীদ হয়েছেন। অনেক বিধবা রয়েছেন যারা তাদের ইদ্দতের সময় পূর্ণ করছেন। ঈদ সত্ত্বেও তারা বেদনা-ভারাক্রান্ত। এমন সন্তান আছেন যারা এ বছর ঈদে তাদের পিতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। অনেক মা আছেন যারা তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে বুকের সাথে লাগিয়ে ঈদ মুবারক বলতেন, কিন্তু এ বছর তাদের কবরে গিয়ে দোয়া করে নিজে হৃদয়ে সান্ত্বনা খুঁজবেন। অনেক এমন পিতা আছেন যারা তাদের ছেলেদের সহায়তায় ঈদের নামায পড়তে যেতেন। এখন অন্য কারো সহায়তায় তাদের কবরে দোয়া করতে যাবেন।

এটি এমন পরিস্থিতি যে রক্ত সম্পর্কীতদের বরং অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও আজ অস্থির করবে এবং ঈদের আনন্দের স্থলে দুঃখকর অবস্থা সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমরা যদি ভেবে দেখি, রমযানে ও ঈদের দিন পৃথিবীতে কত মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং ধৈর্য্য ধারণ করতে হয়। এ শহীদদের মৃত্যু তো জামাতকে জীবন দানের জন্য হয়েছে। এ শহীদগণ তো তাদের প্রাণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্য

প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আজ আমাদের ঈদ উদযাপন না করার কোন কারণ নেই। যখন আমরা ঈদ উদযাপন করব এবং এ ঈদের দিন হৃদয়ের কষ্ট সমূহকে খোদা তা'লার সমীপে পেশ করব, তখন এ দোয়া সমূহ এ শহীদদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধির মাধ্যম হবে এবং আমাদের জন্যও প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করবে। কষ্টের সময়িক যুগ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের দীর্ঘ যুগে পরিবর্তিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঈদ সম্পর্কিত ইলহাম সমূহ আমাদেরকে ঈদের খুশির সংবাদ দেয়। এজন্য এ প্রশ্নই উঠে না যে আমরা আল্লাহ্ তা'লা ঈদের যে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন তা উদযাপন করব না এবং ঐ আনন্দে অংশ নেব না যা খোদা তা'লা এ যুগের ইমামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, 'আমদন ঈদ মোবারক বাদত' ঈদ তো রয়েছে তা পালন করো বা না করো। (তাযকেরা, পৃ-৬২৬, ৪র্থ সংস্করণ) প্রথম ফার্সী অংশের অনুবাদ হচ্ছে, ঈদের আগমন তোমার জন্য কল্যাণময় হোক।

অতএব, ঈদের আগমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য কল্যাণকর এবং তাঁর কারণে আহমদীয়া জামা'তের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যও কল্যাণকর। মুসলিম উম্মাহর জন্যও প্রকৃত ঈদ তখন হবে যখন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে নিবে। নয়তো আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে এর ব্যাখ্যা করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ঈদের উপকরণ তো সৃষ্টি করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে যে বিজয় সমূহ নির্ধারিত করে রেখেছেন তার উপকরণ তো হয়েছে। এখন তাকে মান্যকারীদের জন্য ঈদ কল্যাণময়। আর যারা তাঁকে মানে নি তারা বঞ্চিত থাকবে। ঈদের সাথে বিজয়ের সংবাদ শুনিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **'আল-ঈদুল আ'খারু তানা'লু মিনহু ফাতহান্ আযীমা'** (তাযকেরা, পৃ-৫৮৬, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪) অর্থাৎ আরেকটি ঈদ রয়েছে যাতে তুমি এক বড় বিজয় লাভ করবে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বিজয় সমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, আবার এ সুসংবাদও ঈদের সাথে এবং ঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছেন, তবে আমরা কেন আমাদের দুঃখ ভুলে গিয়ে যুগ ইমামের সাথে মহা আনন্দে অংশ নেব না। আমাদের এ দুঃখজনক অবস্থায় খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্গত অশ্রুও রয়েছে যা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সমীপে প্রবাহিত হয়, কিন্তু শত্রুদের নিকট নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে না। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ অনুযোগ করে না। নিশ্চয় এ অশ্রু আমাদেরকে বিজয়ের নিকটবর্তী করার কারণ হবে।

পাকিস্তানে আহমদীদের জীবন অতিষ্ট করা হচ্ছে। তাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে এবং তারা যে বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে এসবের মোকাবেলা করছে, এজন্য বিশ্বের সব আহমদীদের তাদের জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও যে মনোবলের সাথে তারা ঈদ উদযাপন করছে, প্রকৃত ঈদ তো তাদেরই। হয়তো বহির্বিশ্বের সব আহমদীগণ জানে না যে শত্রুদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র রয়েছে। এর একটি তাজা উদাহরণ, মর্দান মসজিদে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে বড় ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের নিরাপদে রেখেছেন। আমরা ঐসব লোকদের দেখে নিয়েছি যে তারা কিরূপ চেষ্টা করছে। এসব আহমদীদের মসজিদে আসা নিঃসন্দেহে বড় সাহসের কাজ এবং প্রাণ কুরবানীর জন্য সর্বদা তৈরী থাকার এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। পুরুষগণ তো মসজিদে এসে থাকে, কিন্তু ভয়ের আশংকা থাকায় বর্তমানে নারী ও শিশুদের মসজিদে আসা এবং এক স্থানে সমবেত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। যে কারণে আমার কাছে কয়েকজন নারী অস্থিরতা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন।

সম্ভবত এটি প্রথম ঘটনা যে পাকিস্তানে নারী ও শিশুদের ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক স্থানে সমবেত হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণে এ পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। যে জন্য আমি বলেছি শিশু ও নারীদের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। আমি এসব নারী ও শিশুদের বলছি, শত্রুদের এসব ষড়যন্ত্রের জন্য তোমাদের মসজিদে যেতে বারন করা হয়েছে এবং ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়তে বারন করা হয়েছে, তোমাদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এটি করা হয়েছে। কেননা বাহ্যিক উপকরণ এবং নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ করাও মানবিক দায়িত্ব ও শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত। যদিও আপনারা মসজিদ ও ঈদগাহ্ সমূহে ঈদ উদযাপন করতে পারবেন না, কিন্তু আপনাদের গৃহকে তো দোয়া ও কান্নাকাটি দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন। আপনাদের ঘরগুলোকে দোয়া ও কান্নাকাটিতে এমনভাবে পূর্ণ করে দিন যেন খোদা তা'লা স্বয়ং আপনাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে আমার বান্দীগণ! হে আমার বাচ্চাগণ! **'ফাইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা'** অর্থাৎ 'জেনে রাখ নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে।' আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

অতএব, এ স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং নিশ্চয় আসবে। তোমাদের কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির দিন নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যে পরিবর্তিত হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রতিপন্ন করে দেখাবে। অতএব, তোমরা নিজ প্রভুর সমীপে বিনত হওয়া ও কান্নাকাটি করা থেকে কখনো ক্লান্ত হয়ো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, 'ছেলেরা বলে কাল ঈদ, নয় তো পরশু হবেই।' (তাযকেরা, পৃ-১৬১, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪)

অতএব, আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তা'লা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয়। সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

জার্মানী জলসার একটি অধিবেশনে জার্মানদের প্রতি আমার একটি বক্তব্য ছিল। অ-আহমদী এবং অমুসলমান জার্মানগণও এসেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ ভাবতে পার। কিন্তু আমরা এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, যে জামাত আল্লাহ্ তা'লা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এটিই এখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ অটল নিয়তিকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু তা হবে প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নয়, ত্রাস সৃষ্টি করে নয়, নিষ্পাপ লোকদের হত্যা করে নয়, কারো সম্পদ ও জমি জবর দখল করে নয়, রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা করে নয়। বিশুদ্ধ অন্তরে পৃথিবীতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য এটাই এবং এটি অতিকথন নয়। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা এটি পূর্ণ করবেন। যখন পৃথিবীতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, ঐ দিনই আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের দিন হবে। আহমদীগণ শহীদ হচ্ছে, বিভিন্ন কুরবাণী করছে, নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে গৃহহীন হচ্ছে, তবে এ ঈদকে স্বাগত জানানোর জন্য যা আহমদীয়া জামা'তের জন্য নির্ধারিত আছে, আহমদীয়া জামা'তের জন্য বাহ্যত দৃষ্ট এ রাত সমূহ আল্লাহ্ দৃষ্টিতে কদরের রাত্রি (সৌভাগ্যের রজনী) যা ঈদের খুশীর পূর্বে প্রতি রমযানেও আগমন করে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত মহাপুরুষদের যুগেও এসে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরন আমি আমার খুতবাতেও বর্ণনা করেছি। এসব রাতই কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করে মহা বিপ্লব ঘটায় এবং এরপর এক ঈদ নয় বরং ঈদের এক ধারা আরম্ভ হয়।

আজ পাকিস্তান বা অন্য কিছু স্থানে জামা'ত কষ্টের যুগ অতিক্রম করছে, তাতে কি? যে কষ্টের যুগ তারা অতিক্রম করছে, এ দুঃখ-কষ্ট তো আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয়ের পথ প্রদর্শন করছে। অতএব, এ বিষয়টি স্মরণে রেখে ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার করুণা, সাহায্য ও তাঁর সাক্ষাত যাচনা করতে থাকা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী করেছেন, যেজন্য বাহ্যত ঘর সমূহে দুঃখকর অবস্থা বিরাজমান, অনুরূপভাবে নারী ও শিশুদের ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে না পারার দুঃখ, এ দুঃখ কষ্টগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিন। এ দোয়া করুন যেন আমাদের ধৈর্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গৃহীত হয়ে তাঁর দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য হয়ে যায়। এরপর বিশ্ববাসী দেখবে কুরবানী সমূহ ও শহীদদের রক্ত কত বড় পরিবর্তন সাধন করতে পারে। আসুন আজ আমরা এ দোয়া করি, আমাদের ধৈর্য ও মনোবল যেন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা আকষণ করে। তাঁর কৃপা বৃষ্টি যেন পূর্বের চেয়ে অধিক বর্ষিত করার কারণ হয়।

খোদা তা'লা যেন আমাদেরকে প্রকৃত ঈদের আনন্দ, খোদা তা'লার দৃষ্টিতে যা প্রকৃত ঈদ, সেটি দান করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের সকলকে আজ ঈদের প্রেক্ষিতে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক।

আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তা'লা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয়। সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে আহমদী শহীদদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাদের পরিবার ও স্বজনদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সদিচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করুন এবং তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। পাকিস্তানের অধিবাসী সব আহমদীদের নিজ হিফাযতে রাখুন। তাদের দুঃখ আনন্দে পরিনত করুন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে যারা বন্দী আছেন তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। মালী কুরবানীকারীদের সম্পদে অগণিত বরকত দান করুন। বর্তমানে পাকিস্তানে জামা'তের সদস্যগণ জামাত ও জামা'তের স্থাপনা সমূহের নিরাপত্তার জন্য যে কুরবানী করছেন, তাদের জান-মালের হিফাযতের জন্যও দোয়া করুন। সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের জন্য এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য খুব দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। সবাই নিজেদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তার খাঁটি ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিণত করেন।

[খুতবা সানীয়ার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন। এরপর বলেন:]

আমি বিনীতভাবে আরেকটি ঘোষণা করছি, বরং ক্ষমা চাচ্ছি যে সাধারণত এ ঈদে আমি প্রত্যেকের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করি। কিন্তু গত চার পাঁচদিন যাবৎ আমার বাহুতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে। ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছে যে করমর্দন না করাই উত্তম। খুব শক্তিশালী ব্যাথা নাশক ওষুধ খেয়ে এখনো ঠিক আছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কাজে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু আমার ধারণা চার পাঁচ হাজার লোকের সাথে করমর্দন করলে হয়তো ব্যথা কিছু না কিছু বেড়ে যাবে। এজন্য আমার ধারণা সতর্কতার জন্য এবং ডাক্তারের পরামর্শও এটাই যে করমর্দন না করাই উত্তম। এজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। তবে সমস্ত হলে গিয়ে সবাইকে আমি অবশ্যই ঈদ মোবারক জানাব।

আপনাদের সবাইকে ঈদ মোবারক। যে যেখানে বসে আছেন বসে থাকুন। আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনারা বসে থাকুন বা জামাতী কোন প্রয়োজনে বসার প্রয়োজন থাকলে বসুন, নয়তো অবশ্যক নয়।

আল্লাহ্ তা'লা সকলের হাফেয হউন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহ্।

অনুবাদ: **মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

করোনার আদ্যোপান্তঃ
সর্বশেষ গবেষণার আলোকে

ডা. সেলিম মুহাম্মদ খান
এমবিবিএস, এমপিএইচ, পিএইচডি; পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো, ক্যালগ্যারী ইউনিভার্সিটি, কানাডা
সাবেক হেড অব সাব-অফিস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সুদান

করোনা মহামারী বৈশ্বিক-রূপ ধারণ করে সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে ফেলেছে। রোগটির বিস্তার বিদ্যুৎ গতিতে পৃথিবীর ২০৯টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত ১৬ লাখের অধিক লোক এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ও এক লক্ষের অধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে [১৫ মে পর্যন্ত করোনা ভাইরাস প্রায় ২১০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রান্ত প্রায় ৪০ লাখের অধিক এবং মৃতের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখের অধিক]। মনে হচ্ছে আজ করোনা মৃত্যুর এক হোলী খেলায় মেতে উঠেছে। এর শেষ কোথায় তা সঠিক করে কেউ বলতে পারছে না। এ প্রবন্ধে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং করোনা প্রতিরোধে আমাদের কী করণীয়– এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

শুরুর কথা

করোনা একটি ভাইরাস জনিত রোগ। গত বছর ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর চীনের উহান শহরে এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী সনাক্ত হয়। ৩১শে ডিসেম্বরে চীন থেকে এ রোগের প্রাথমিক রিপোর্টটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সংবাদ মাধ্যমে আসে। ২০২০ সালের ২২ জানুয়ারি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু ঘটে উহান শহরে। একটি সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণীর ভাইরাস এ রোগের জন্য দায়ী যাকে প্রথমে SARS COV-2 এবং পরে নভেল করোনা ভাইরাস -nCOV-19 নাম দেওয়া হয়। ৩০শে জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে বিশ্ব জনস্বাস্থ্যের জন্য এক জরুরী উদ্বেগ (Public Health Emergency of International Concern) বলে ঘোষণা দেন এবং এ রোগের অফিশিয়াল নাম প্রদান করে COVID-19। বিশ্বব্যাপী এর দ্রুত বিস্তারের প্রেক্ষিতে ১১ই মার্চ ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে বৈশ্বিক মহামারী (pandemic) হিসেবে ঘোষণা দেয়।

ভাইরাস রহস্য

করোনা ভাইরাসের বিষয়ে বিস্তারিত জানার আগে চলুন ভাইরাস সম্পর্কে মৌলিক কিছু তথ্য জেনে নেয়া যাক। ভাইরাস শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে যার ইংরেজী হল পয়জন এবং বাংলায় বিষ। ভাইরাস অতি ক্ষুদ্র এক অনুজীব যা খালি চোখে তো দূরের কথা, সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। ভাইরাস দেখতে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন হয়। আমাদের এ পৃথিবীর সর্বত্র ভাইরাসের বিচরণ রয়েছেঃ মাটিতে, পানিতে, বাতাসে এমনকি সাগরের নোনা পানিতেও অসংখ্য ভাইরাসের অনুকণা ছড়িয়ে রয়েছে। এককোষী এ অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস নির্জীববস্তু ও জীবের মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে অবস্থান করে যা কেবল জীবদেহে প্রবেশের পরই নিজস্ব প্রাণ পায় ও বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। খোলা চোখে অদেখা এ ভাইরাসগুলো সংখ্যায় এতো বেশি যে, এদের একটার পর একটা সারিবদ্ধ করলে পৃথিবী থেকে ২০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত যে গ্রহ K2-155d বা সুপার আর্থ রয়েছে সেখান পর্যন্ত তা দীর্ঘ হবে। সুতরাং জানা গেল যে, ভাইরাসকে বেঁচে থাকতে ও বংশ বিস্তার করতে অন্য কোন প্রাণীকোষের ভেতরে প্রবেশ করা আবশ্যক, তা না হলে সে নির্জীব অবস্থায় একটা সময় পর্যন্ত পড়ে থাকবে এবং অবশেষে এমনিতেই মারা যাবে। প্রকারভেদে ভাইরাস কেবল মানুষকে নয়! সকল প্রাণী, গাছপালা, এমনকি অন্যান্য অনুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়াকেও আক্রমণ করতে পারে।

ভাইরাসের ইতিহাস

১৮৯২ সালে একজন রাশান উদ্ভিদবিদ দিমিত্রি ইভানোভস্কি লক্ষ্য করেন ব্যাকটেরিয়ার মতো একটি অনুজীব তামাক পাতাকে খেয়ে ফেলছে। তার এই আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা প্রথম জানতে পারি ভাইরাস নামের এক ভিন্ন অনুজীব আছে, যা ব্যাকটেরিয়া নয়। ১৮৯৮ সালে ফরাসী জীববিজ্ঞানী মার্টিনস বাইজেরনিক এ অনুজীবটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস হিসেবে বর্ণনা করেন যা বহুল আলোচিত টোবাকো মোজাইক ভাইরাস নামে সমধিক

পরিচিত। ১৯০১ সালে মানুষের দেহে প্রথম ভাইরাস সনাক্ত করেন ওয়াল্টার রিড, যার নাম দেয়া হয় "ইয়েলো ফিভার ভাইরাস"। ভাইরাসের গড়নে থাকে (১) একটি জেনেটিক উপাদান, ডিএনএ (DNA) বা আরএনএ (RNA)-র একটা লম্বা চেইন, যার ভেতরে একটি প্রোটিনের কীলক প্রবিষ্ট থাকে (২) জেনেটিক বস্তুটিকে ঢেকে রাখা একটি প্রোটিনের আবরণ (capsid) (৩) এক বা দুই পাট্টার ফ্যাট বা লিপিডের আবরণ। ভাইরাস কিভাবে পৃথিবীতে এলো তা নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলে ব্যাকটেরিয়া থেকে এর জন্ম, কেউ বলে প্লাজমিডস নামক কোষ থেকে কোষে চলাচলকারী ডিএনএ থেকে এর উদ্ভব। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ভাইরাস এক অত্যাশ্চর্য ভূমিকা পালন করে। আমরা যাকে বলি জেনেটিক ডাইভারসিটি বা জীনবৈচিত্র্য। তা বিভিন্ন ধাপে জীনের রূপান্তর ঘটিয়ে জীববৈচিত্র্য নির্ধারণ করে।

করোনা ভাইরাস কি?

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে এই ভাইরাসকে মাথার মুকুটের মতো দেখা যায়। ল্যাটিন ভাষায় করোনাম (Coronam)-এর ইংরেজী হল crown যার বাংলা হল মুকুট। মুকুটে বিদ্ধ কাটার মতো যে বস্তুগুলো দেখা যায় সেগুলি হল ভাইরাসের দেয়ালে প্রোথিত গ্লাইকোপ্রোটিন (spike glycoproteins)। এদের মূল কাজ হল মানুষের শরীরে গ্রহীতা প্রোটিনের (receptor protein) গায়ে গেথে কোষের ভেতর ঢুকা। প্রকৃতিতে হাজার রকমের করোনা ভাইরাস বিদ্যমান যা সাধারণত অন্যান্য প্রাণীতে রোগের সৃষ্টি করে যেমন: বাদুড়, বানর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। কিন্তু এইসব প্রাণী থেকে যখন প্রজাতির দেয়াল ডিঙ্গিয়ে (spill over) মানুষের মধ্যে চলে আসে এবং রোগের সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় জুনোসিস' বা প্রাণীঘটিত রোগ।

করোনার রকমফের (Different Corona Viruses)

আজ পর্যন্ত মাত্র সাতটি করোনা ভাইরাস মানুষের মধ্যে রোগের সৃষ্টি করেছে। ১৯৬০-এর দশক থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত ভাইরাসের শ্রেণীবিন্যাস শুরু হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, সাত ধরণের করোনা ভাইরাসের মধ্যে প্রথম চারটি সাধারণত মৃদু বা কম মারাত্মক; বাকি তিনটা মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতীয়মান হচ্ছে বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী 'কোভিড-১৯ সৃষ্টিকারী নতুন ভাইরাস- Novel SARS-COV-2l।

আমাদের আলোচ্য করোনা পরিবারে চার প্রকার ভাইরাস রয়েছে: ১) আলফা করোনা ২) বিটা করোনা ৩) গামা করোনা ৪) ডেলটা করোনা। এই ভাইরাস গুলি মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। সবচেয়ে ক্ষতিকারক বিটা করোনা ভাইরাসের আবার তিনটি প্রকারভেদ আবিষ্কৃত হয়েছে:

১) **SARS COV:** এর সংক্রমন হংকং থেকে শুরু হয়ে ২০০৩ সালে প্রথমে এশিয়ায় এই ভাইরাস মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। পরে তা ইউরোপসহ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সে মহামারীতে ৮শ'র মতো মানুষ প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। তবে ২০০৪ সালের পর এই ভাইরাসে আর কেউ আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট আসেনি।

২) **MERS-CoV:** ২০১২ সালে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে প্রথমবার এই ভাইরাসের সংক্রমন শুরু হয়। যারা এই ভাইরাসে আক্রান্তদের সংস্পর্শ থেকে তা অন্যত্র ছাড়াতে থাকে; এতে তা বড় কোন মহামারীর জন্ম দেয় নি।

৩) **SARS COV-2:** ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর চীনের উহান শহরে এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী সনাক্ত হয়। এটি করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত। করোনার CO, ভাইরাসের VI এবং ডিজিসের D নিয়ে হয়েছে COVID-19। ২০১৯ সালে ভাইরাসটি প্রথম ধরা পড়ায় এর নাম দেয়া হয় COVID-19।

করোনার গঠন (Structure)

এই নভেল করোনা ভাইরাসটি একটি দুইপাট্টার (bilateral) RNA আবরনে ঢাকা ভাইরাস। ধারণা করা হচ্ছে এই ভাইরাসটি বাদুড়ের দেহ থেকে প্যাঙ্গোলিন নামক একটি পিঁপড়া খেকো প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়েছে। ভাইরাসটি চোখ, নাক-মুখ- দিয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। প্রাথমিকভাবে গলগহবরে অবস্থান ও বংশবৃদ্ধি করে এবং কয়েকদিনের মধ্যে শ্বাসনালীর বা শ্বাসযন্ত্রের যে কোষগুলোতে ACE-2 (Angiotensin Converting Enzyme ২) Receptor থাকে শুধু ঐ কোষগুলোতে প্রবেশ করে। এযাবৎ করা গবেষণা হতে জানা যায় যে, মশার কামড়ে, রক্তের মাধ্যমে বা গর্ভকালীন সময়ে মা থেকে নবজাতকের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়ায় না।

করোনা রোগেপ্রবাহ ও লক্ষণ (Disease Flow and Symptoms)

সুপ্তিকাল (Incubation Period): দেহে প্রবেশ করার পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সময়টাকে সুপ্তিকাল বলে। করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এ সময়টা ১-১৪ দিন; তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ৫ দিনের মধ্যেই লক্ষণ দেখা যায়। অন্যদিকে সাধারন ফ্লুতে ১-৩ দিনেই লক্ষণ প্রকাশ পায়। দীর্ঘ সুপ্তিকাল করোনাকে অধিক ছড়ানোর ক্ষমতা দিয়েছে। এটা সাধারন ফ্লুপ থেকে আড়াইভাগ অধিক ছোঁয়াচে। ফ্লুর তুলনায় ১০ ভাগ অধিক হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এবং মৃত্যুহার বয়সভেদে শতকরা ২ থেকে ২০ ভাগ।

এই ভাইরাস মানব দেহে প্রবেশ করার পর রোগটি তিনভাবে প্রকাশ পেতে পারে ১) কোন উপসর্গ দেখা যাবেনা- Sub-clinical infection

২) প্রথমদিন: অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ও গায়ে ব্যাথা; কারো কারো স্বল্পমাত্রায় জ্বর ও শুকনা কাশি দিয়ে শুরু হতে পারে; কারো বা ঠাণ্ডাসহ কাপুনি, ঘাম ও কয়েক মিনিটের জন্য ৩৮ডিগ্রির বেশীও জ্বর হতে পারে;

৩) দ্বিতীয় দিনে ৩৮ ডিগ্রির উপরে জ্বর, গলা ব্যাথা থাকতে পারে;

৪) তিন-চার দিনের মাথায় হাল্কা জ্বর, সাথে কাশি ও গলা ব্যাথা হয়;

৫) ৫ম দিনে মাথা ব্যাথা হয়, পেটের অসুখও থাকতে পারে।

৬) ষষ্ঠদিনে শরীরে ব্যাথা বাড়ে, মাথা ব্যাথা কমে; তবে পেটের সমস্যা থাকতে পারে ও পাতলা পায়খানা হতে পারে

৭) ৭/৮ম দিনে হয় সব লক্ষণ আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকবে অথবা যাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল বা কোন জটিল অসুখ আছে, তাদের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহের মাথায় বেশি মাত্রায় জ্বর-কাশি এবং সাথে শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ ও ব্যাথা (ফুসফুসের প্রদাহ বা নিউমোনিয়া) হয়। এ অবস্থায় রোগীর রক্তবমিও হতে পারে।

৬) যদিও করোনা ভাইরাসজনিত ফুসফুসের ক্ষতির কথা সবাই জানে, জন হপকিন্স ৭ এপ্রিল জানাচ্ছে যে অনেক রোগীর হৃদযন্ত্রের সমস্যা হয়েছে এবং তারা কার্ডিয়াক এরেস্টে মারা গেছে।

৭) কানাডার পিট্‌সবার্গনিউরোলজিস্টরা করোনা রোগীর ঘ্রাণশক্তি হ্রাস পাওয়া, মতিভ্রংশতা (disorientation), এমনকি খিঁচুনীও লক্ষ্য করেছেন।

করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায়? (How does it spread)

করোনা ভাইরাস আমাদের হাঁচি, কাশি ও জিহ্বার লালা, নাকের সর্দির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ক) সরাসরি: ইনফ্লুযঞ্জো ভাইরাসের মতো করোনা ভাইরাসও সরাসরি না ঢেকে হাঁচি বা কাশি থেকে ড্রপলেট ক্ষুদ্র অনুদানার মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়ায়।

খ) **হাতের মাধ্যমে:** আক্রান্ত রোগীদের কেউ যদি হাঁচি বা কাশি হাত দিয়ে ঢেকেও দেয় তবে সেই হাতে লাগা ভাইরাস অন্য কারো সাথে হাত মিলালে যুক্ত হাতের মাধ্যমে ভাইরাস চলে আসতে পারে চোখে, নাক বা গলায়।

গ) **অন্যান্য বস্তুর মাধ্যমে:** বাহ্যত সুস্থ্য ভাইরাস বহনকারী বা আক্রান্ত রোগী যে কোন বস্তু দরজার বা যানবাহনের হাতল, বা যে কোন কিছু স্পর্শ করলে সেখান থেকে অন্য সুস্থ ব্যক্তির হাত ভাইরাসের সংস্পর্শে আসতে পারে; উপাদান ভেদে ধাতব, কাঠ, প্লাস্টিকের উপতলে করোনা ভাইরাস ১-৩ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বাতাসে তিন ঘন্টা পর্যন্ত ভেসে বেড়াতে পারে।

এখন পর্যন্ত অক্ষত ত্বকের মাধ্যমে সরাসরি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ মিলে নি। ভাইরাসটি কেবল চোখ, নাক ও মুখের মিউকাস বা অন্তরাবরনের সংস্পর্শে এলেই তা দেহ কোষের ভেতর ঢুকে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করা শুরু করতে পারে। যদিও আক্রমণের তীব্রতা নির্ভর করে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বয়স, লিংগ, সার্বিক স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জাতিগত পার্থক্যের উপর যা নীচে আলোচনা করা হল।

বয়স, লিংগ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জাতিগতপার্থক্য (Differences in age, gender, environment and ethnicity)

করোনা সকল বয়সের (১-১০০+) মানুষকে আক্রান্ত করেছে। যদিও অল্প বয়সী শিশুরাও আক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে মৃত্যুও ঘটেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের শরীরে অন্য কোন ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধজনিত অসুখ বা বৈকল্য ছিল কিনা। সাধারনভাবে সবাই আক্রান্ত হলেও ৫০ উর্ধ্বদের অধিক উপসর্গ দেখা দেয়। এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে বেশী আক্রান্ত হচ্ছেন। যারা ধুমপায়ী, মদ্যপায়ী এবং এ দ্বারা যারা নিজেদের ফুসফুসকে প্রদাহযুক্ত ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলেছেন, যারা ইতোমধ্যে শ্বাসতন্ত্রের বা ফুসফুসের, হৃদরোগ, কিডনিরোগ, উচ্চ রক্তচাপের বা অন্য কোন সিস্টেমের রোগে আক্রান্ত, যারা স্বাস্থ্যগতভাবে দুর্বল, যেমন বৃদ্ধ বা যারা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত করোনা ভাইরাসের আক্রমণ তাদের জন্য ভয়াবহ হয়। কোন কোন ভাইরাস যেমন HIV, ভাইরাল হেপাটাইটিস ও HPV সংক্রমণ আমাদের দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে পরাস্ত করে দেয়, এখন পর্যন্ত এই নতুন করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন কোন দেশে মৃত্যু হার বেশি হওয়ার কারণ সেই দেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যাধিক্য, যেমন– ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স। অন্যদিকে জার্মানির জনগোষ্ঠী বয়স্ক হলেও উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং জন সচেতনতার জন্যে মৃত্যুহার অনেক নিম্নে রয়েছে। আজ পর্যন্ত ব্যাপক সংক্রমণের হার শীত প্রধান অঞ্চল যেখানে তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির নীচে সেখানেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও এবিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য মেলে নি, গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় করোনার প্রকোপ শীত প্রধান ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোর তুলনায় কম হবে বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় বেশী আক্রান্ত হচ্ছেন; তবে জাতিগত পার্থক্যটি তাদের সংস্কৃতির সাথে সাথে ঘনবসতি, পরিচ্ছন্নতা এবং সার্বিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।

এখন পর্যন্ত গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে সচেতনামূলক এবং প্রতিরোধ কার্যক্রমই এই মরণব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

প্রতিরোধ: প্রতিকারই একমাত্র উপায় (Prevention: Only way out)

এই মুহূর্তে এই কোভিড-১৯ বিস্তাররোধে জন সচেতনতা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সর্বোত্তম পন্থা। বিস্তার রোধে সবাইকে যা যা করতে হবে:

১) সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সবচেয়ে কার্যকর সহজ এবং সুলভ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এর আওতায় আসে।

ক) নিজ ঘরে বা বাসায় থাকা; ঘরে থেকে কাজ করা সম্ভব হলে অফিসের সাথে কথা বলে তাই করা এবং অতি জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া। সম্ভব হলে অনলাইনে বাজার করা।

খ) বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের হবেন না। অতি জরুরী প্রয়োজনে বের হতে বাধ্য হলে যেমন, জরুরী সেবার জন্য কাজে যাওয়া, বাজার করতে, ওষুধ কিনতে বা নিতে, এবং হাঁটতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে নির্দেশমত (recommended) দূরত্ব (১-২ মিটার বা ৩-৬ ফুট) বজায় রাখা। গাড়ীতে বা টেক্সিতে বের হলে জানালার গ্লাস বন্ধ রাখা।

গ) কোন রকম জনসমাবেশ (পাবলিক, ধর্মীয় বা সামাজিক মিটিং, সম্মিলিত ইবাদত, দাওয়াত ইত্যাদি) এড়িয়ে চলা।

ঘ) যেকোন সৌজন্যমূলক সাক্ষাত, এমনকি রোগী দেখা, হাসপাতালে যাওয়া, বিশেষ করে বয়স্ক আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাত পরিহার করা। ঘরের লোকজনের সাথেও শারিরীক মেলামেশা যথাসম্ভব সীমিত রাখা, ছোট বাচ্চাদের মুখে চুমো না খাওয়া।

ঙ) গনপরিবহন এড়িয়ে চলা; সম্ভব না হলে হাঁচি কাশির শিষ্টাচার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। হাত না মেলানো। খোলা খাবার বা বাইরে কোন খাবার না খাওয়া। ব্যবহৃত কোন জিনিষ শেয়ার না করা।

২) বাইরে থেকে ঘরে ফেরার সাথে সাথে এবং নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে ভাল করে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া বা এলকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। বিশেষ করে বাইরে থেকে আসার সাথে সাথে তা করা। এক্ষেত্রে কুসুম গরম পানির ব্যবহার ঠাণ্ডা পানির চেয়ে ভাইরাস ধ্বংসে অধিক কার্যকর।

৩) পাবলিক স্পটের কোনকিছু খোলাহাতে স্পর্শ না করা, করতে হলে হাতে গ্লাভ্‌স পরা বা টিস্যু দিয়ে ধরা। ফের চোখ, নাক ও মুখে অপরিষ্কার হাত দিয়ে স্পর্শ না করা।

৪) হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু দিয়ে মুখ ঢাকা। তেমন কিছু না পেলে হাতের ভাঁজকরা কনুইয়ে হাঁচি বা কাশি দেওয়া। এতে হাত ভাইরাসে দূষিত হবে না যা আমাদের অজান্তেই চোখ, নাক, মুখ বা অন্য কিছু স্পর্শ করতে পারে।

৫) মুখে মাস্ক পরলে স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্যই সুরক্ষা পাওয়া যায়; কিন্তু উপসর্গ প্রদর্শনকারী রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এতে কার্যকর সুরক্ষা হয়।

৬) কাঁচা খাবার বা যথাযথভাবে সিদ্ধ না করা খাবার এড়িয়ে চলা। যেসব ফল কাঁচা খাওয়া যায় তা যথাযথভাবে ধুয়ে খাওয়া।

৭) ভিটামিন সি যুক্ত খাবার, সবজি ও ফলমূল বেশি খাওয়া; খাবারে ভিটামিন সি যথেষ্ট না থাকলে ভিটামিন সি ক্যাপসুল খাওয়া।

৮) পরিমিত সূর্যের আলো এবং খোলা বিশুদ্ধ হাওয়া গ্রহণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে চাঙা রাখতে সাহায্য করে।

৯) যথেষ্ট পরিমাণে (প্রতিদিন অন্তত ২ লিটার বা ৮ গ্লাস) পানি পান করা; অধিক চিনিযুক্ত হাল্কা পানীয়, ধূমপান ও মদ্যপান না করা।

১০) অধিক রাত না জাগা এবং পরিমিত ঘুমানো।

১১) লক্ষণ দেখা মাত্রই চিকিৎসা সেবা নেয়া। এজন্য যে হাসপাতাল বা ডাক্তারের চেম্বারে যেতে হবে তা নয়। জনস্বাস্থ্য বিভাগে (public health) বা জরুরী সেবার (emergency services) ইমার্জেন্সী নাম্বারে ফোন করা। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক আপনার কথা শুনে অবস্থামত পরামর্শ দিবেন। মনে রাখবেন আপনার সাধারণ ঠাণ্ডা সর্দিজ্বর হতে পারে আর আপনি দৌড়ে হাসপাতাল বা চেম্বারে গিয়ে করোনায় সংক্রমিত হয়ে আসতে পারেন। অথচ ঘরে বিশ্রাম নিলেই আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল হয়ে যাবেন।

রোগ বিস্তার রোধ

ক) পৃথকীকরণ (Isolation):

যদি আপনার এমন উপসর্গ– যেমন: সর্দি, কাশি, জ্বর এর কোন একটিও থাকে, তাহলে দুই সপ্তাহ বা ১৪ দিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে ঘরে থাকুন। এতে করে আপনার থেকে অন্যদের মাঝে সংক্রমণ রোধ পাবে। ঘরে অন্যদের থেকে আপনার দূরত্ব (২ মিটার বা ৬ ফুট) বজায় রাখুন। আলাদা বেসিন ও বাথরুম ব্যবহার করুন; থালাবাসন ও বিছানা আলাদা করে নিন; আলাদা রুমে ঘুমান। কোন ঘরে এসব নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে, সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক এ চলে যান। এতে আপনার আপনজনদের সুরক্ষা হবে। এসময়ে আপনি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, দোকান বা ধর্মীয় উপাসনালয়ে যাবেন না।

যদি আপনার ছোট বাচ্চার মৃদু উপসর্গ থাকে তাকে সাবধানতার সাথে বাসায় রেখে চিকিৎসা করা হাসপাতালের চিকিৎসা থেকে নিরাপদ হবে। তবে হ্যাঁ কোন রকম শ্বাস কষ্টের লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে বা জরুরী নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

খ) কোয়ারেন্টিন: (Quarantine)

আপনি যদি ভ্রমণ (বিমান, প্রমোদ তরী, ট্রেন) থেকে আসেন বা এমন কোন লোকের সংস্পর্শে এসে থাকেন (জনসভা, মিটিং, সেমিনারে যোগদান করা বা হোটেলে অবস্থানকালে) যিনি করোনা ভাইরাস রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তাহলে নিজে সম্পূর্ণ সুস্থ্য থাকলেও দুই সপ্তাহ বা ১৪ দিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আলাদা করে রাখুন, উপরের নিয়মে ঘরে থাকুন বা সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক এ চলে যান। বর্তমানে এটা করার জন্য আপনি বাধ্য।

চিকিৎসা: (Treatment)

এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা বা ভেকসিন আবিষ্কৃত হয় নি। ফ্রান্সে কেবল ৩৬ মরণাপন্ন রোগী যাদের আইসিইউতে পাঠানো হয়েছিল তাদের

ওপর ক্লোরোকুইন (Hydroxy chloroquine) ব্যবহার করা হয়। সেটা কোন নিয়মমাফিক রেনডমাইজড কন্টোল্ড ট্রায়াল ছিল না। কানাডা, জাপান, আমেরিকা এবং ভারতসহ আরও কয়েকটি দেশে এন্টি ম্যালেরিয়া, এন্টিবায়োটক (Azythromycin) ও এন্টি ভাইরাল (Remdesivir) ইত্যাদি ওষুধের ওপর এরকম কয়েকটি গবেষণা চলছে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হিউম্যান ট্রায়ালের ফলাফল পেতে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগবে। করোনা রোগীদের ব্যাথানাশক NSAID যেমন ইবুপ্রুফেন, ACE Inhibitors জাতীয় ওষুধের ব্যবহার ফলদায়ক প্রমাণিত হয় নি। পৃথিবীর অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা দিনরাত এক করে কাজ করে যাচ্ছেন করোনার ওষুধ ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য। আমরা আশা করি তারা শীঘ্রই তাদের প্রচেষ্টায় সফল হবেন। তাই নিশ্চিত কিছু জানার আগে কোন ওষুধের উল্লেখ করা হল না। চিকিৎসা এখন পর্যন্ত উপসার্গিক (symptomatic)- রোগীকে আলাদা পরিষ্কার হাওয়া বাতাসযুক্ত রুমে রাখতে হবে, শরীরের পানীয় নিশ্চিত করতে হবে, রক্তের চাপ, অক্সিজেন লেভেল, ফুসফুসের তরলের পরিমাণ দেখতে হবে। জ্বর হলে পরিমাণমত জ্বরের ওষুধ (paracetamol) দেয়া যেতে পারে যেন লিভারে অধিক চাপ না পড়ে।

ভেকসিনের এক্ষেত্রে আশার কথা হল এইডসের ভাইরাস সনাক্ত করতে যেখানে প্রায় দুই বছর লেগেছিলো, সেখানে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই এই নভেল করোনা ভাইরাসটি সনাক্ত হয়ে যায় এবং ইতোঃমধ্যেই এর জিনের গঠন (genomic structure) জানা হয়ে গেছে। এর মিউটেশন রেট খুব বেশি না। ভাইরাসের জিনামে, অরিজিন সম্পর্কে জানার পর এখন ভাইরাসটি কীভাবে ডিটেক্ট করতে হয়- তাও জানা গেছে। করোনার প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারের জন্য বেশ কয়েকটি ওষুধ ও করোনা রোগীর সিরামনিয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে। এবিষয়ে আগামী জুনের মধ্যে কিছু ফলাফল পাওয়ার আশা রয়েছে।

এক্ষেত্রে ঘরোয়া চিকিৎসার মধ্যে অধিক (৭-১০ ঘন্টা) বিশ্রাম গ্রহণ, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, প্রচুর বিশুদ্ধ পানীয় পান (২০ মিনিট পর পর কয়েক চুমুক কুসুম গরম পানি পান করা); ভিটামিন সি যুক্ত টাটকা ফলমূল খাওয়া; আদা-চা, লেবু-মধু সহ কুসুম গরম পানিয়, হলুদ, রসুন, কালোজিরাসহ অন্যান্য ভেষজ যেগুলো সাধারণ ভাইরাসের ক্ষেত্রে কার্যকর সেগুলোর কার্যকারীতা করোনা ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রমাণিত।

আরোগ্য সম্ভাবনা (Prognosis):

আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা আশি থেকে পঁচাশি ভাগ রোগীর উপসর্গ মৃদু যদিও তাদের শারীরিক অবস্থা সাধারণ ঠাণ্ডা বা আমাদের পরিচিত ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে মারাত্মক। এসব রোগী কোন প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা ছাড়া অথবা সাধারণ ঘরোয়া চিকিৎসায় দু'সপ্তার মধ্যে ভালো হয়ে যায়। পনের থেকে বিশ ভাগ রোগীর এক সপ্তাহের মধ্যে শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে যাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। ভর্তি রোগীদের শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ রোগীর তীব্র শ্বাসকষ্ট (ARDS) হয় এবং তাদের আইসিইউ (ICU) সাপোর্টের প্রয়োজন হয় যেখানে প্রয়োজনে অক্সিজেন ও ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দিতে হয়। মারাত্মক রোগীরা তিন থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত অসুস্থ থাকতে পারেন। এর মধ্যে শ্বাসকষ্টের উন্নতি না হলে অবস্থা অনুসারে যে কোন সময় রোগী মারা যেতে পারে।

মোটের উপর শতকরা দু'ভাগ লোকের মৃত্যু ঘটে, তবে তা অধিক বয়সী ও পূর্বে যারা কোন জটিল রোগে ভোগেছিলেন তাদের ক্ষেত্রে অধিক।

স্বাভাবিক ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিরোধ (Herd Immunity)

সুখবর হল, যে কোন ভাইরাসের মতো করোনা ভাইরাসও একবার মানবদেহকে আক্রান্ত করলে এটি দেহে একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune system) গড়ে উঠে। ফলে পরবর্তী আক্রমণে এই ভাইরাস শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কাবু হয়ে পড়ে এবং কোনো ক্ষতি করতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, করোনা ভাইরাস হয়তো ইতোঃমধ্যে আমাদের অনেকের দেহেই প্রবেশ করেছে, কিন্তু শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমের জন্য সামান্য কাশি বা সর্দি ছাড়া তেমন কোন লক্ষণ সৃষ্টি করে নি এর ফলে আমরা টেরও পাই নি। ফলে এসব ভাগ্যবান ব্যক্তিরা বিনা যুদ্ধেই করোনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। কোন দেশে বা সমাজে যদি শতকরা চল্লিশভাগের বেশী লোকের মধ্যে এরকম স্বভাবিক সামাজিক প্রতিরোধ (Herd Immunity) গড়ে উঠে তাহলে সেখানে সংক্রমণ রোধ হতে পারে। যেমন ২০১০-১১ সালে নরওয়েতে এরকম সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে উঠার জন্য সেখানে Swine flu-এর প্রত্যেক তত বেশী দেখা যায় নি। এটি রোগ বিশেষে শতকরা আশি থেকে পঁচানব্বই ভাগ হয়। তাই করোনার ক্ষেত্রে এ সামাজিক প্রতিরোধ ঠিক কত ভাগ লোকের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সম্ভব তা এখনও গবেষণার বিষয়।

করোনা যুগে মানসিকভাবে ভালো থাকা (Mental Well-being)

করোনা প্রতিরোধে সাবধান হওয়া জরুরী। শংকিত হলে বিপদ না কমে বাড়তে পারে মানসিক বিপর্যস্ততা। তাই শুধু করোনার নেতিবাচক দিকগুলো না দেখে, ইতিবাচক বিষয়গুলো থেকে উপকৃত হতে হবে। পরিবার পরিজন বিশেষ করে বাচ্চাদের সাথে মূল্যবান সময় গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। ঘরোয়া খেলা, সৃজনশীল প্রকল্প, জরুরী জীবন ঘনিষ্ট দক্ষতা অর্জন- রান্না করা, বই পড়া ও ডায়েরি লিখা, বাগান করা, ছবি আঁকা, মেডিটেশন করা, ইবাদতে মনোযোগী হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে এই লকডাউনের সময়টাকে মূল্যবান করে তুলা যায়। প্রতিদিন ছোটদের অন্তত এক ঘণ্টা ও বড়দের ত্রিশ মিনিট ঘরোয়া খেলাধুলা, ব্যায়াম বা যে কোন শারীরিক কসরত করা জরুরী। এতে মানসিক চাপ কমবে। অবশ্যই ধুমপান বা কোন নেশাবস্তু গ্রহণ

মানসিক চাপ কমাবে না বরং এগুলো আত্মহত্যার শামিল বলে প্রমাণিত।

মনে রাখবেন অসুস্থ হওয়া কোন অপরাধ নয়। আপনি সবরকম চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও অসুস্থ হয়ে পড়লে, আপনার ডাক্তার বা পাবলিক হেলথ হটলাইনে ফোন করুন; পরামর্শ নিন এবং সেগুলো মেনে চলুন। বেশীর ভাগ লোক (৮০% এর বেশী) করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হচ্ছেন, আপনিও পারবেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্তবোধ করলে মানসিক সাপোর্ট সেন্টারে ফোন করুন, পরামর্শ নিন ও তা মেনে চলুন। তারা আপনার পরিচয় গোপন রাখবে।

এই ডিজিটাল যুগে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভিডিও-অডিও ফোনে কথা, সাক্ষাত ও কুশল বিনিময় করা, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী যাদের কোন সাহায্যের দরকার, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার মাধ্যমে মানবিকতার চর্চা করা এবং তার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধকে এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে হৃদয়-মনের প্রশান্তি অর্জন করা যায়। এতে করে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্বাস্থ্যও বজায় থাকবে। মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীতে কোনো সংকটই চিরস্থায়ী নয়; জীবনে চড়াই-উৎরাই আছে; সুসময় ও দুঃসময় পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এবং সংকটের পর আসা সুসময়টি সর্বদাই বেশী উপভোগ্য হয়। সবশেষে সবার পরিপূর্ণ সুস্থতা ও নিরাপদ জীবন কামনা করছি।

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, হেলথ কানাডা, এবং জন হপকিনস্ ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট এবং নীচের গবেষণা পেপার থেকে:

Symptoms of Novel Coronavirus (2019-nCoV) - United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China - JAMA, Wang et al., February 7, 2020

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China - Huang et al., The Lancet. January 24, 2020

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study - Chen et al, The Lancet, January 30, 2020

Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Pdf] - World Health Organization, Feb. 28, 2020.

Hakim Water Technology & Filter House
Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com
DRINKING WATER PLANT (INDUSTRIAL)

DRINKING WATER PURIFIER (HOUSEHOLD)
OUR SERVICES:
Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.
VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

কবিতা

শান্তির দ্বীন

সিবগাতুর রহমান

নহে জাতিভেদ সকলের লাগি
গড়া এ বসুন্ধরা,
'বিধর্মী' বলে করিছ আঘাত?
শোন হে পথহারা।

নবীজির পথে কাঁটা বিছাইত
যেই বুড়ি বেদুইন,
তাহার দুঃখে দুয়ারে ছুটেছেন
আমাদের আল-আমিন।

বেদ্বীনের বোঝা কাঁধে চড়াইয়া
হেঁটেছেন মরু পথ,
অপরের তরে নিজেরে বিলাতে
খুঁজেন নি মত-পথ।

আজিকে তোমরা অপরের সুখ
হরন করিছ জোরে,
তোমাদের ভয়ে জড়সড় থাকে
প্রতিবেশী নিজ ঘরে।

ভাইয়ের রক্তে রাঙাইছ হাত
তুমি কেমন মুসলমান?
ইসলাম এসেছে শান্তির লাগি
রাখ নাকি সেই জ্ঞান?

আঁখি জল মুছে হাতে হাত রেখে
চল মোরা সবে গাই,
সকলের তরে সকলে আমরা
যেন সবে ভাই ভাই।

ইসলাম মানে শান্তির দ্বীন
নয়তো তাশের ঘর,
ছোট বড় সবে মিলেমিশে রব
হব নাতো কারো পর।

***

ইসলামী শিক্ষার অনুসরণে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ

মসীহ উর রহমান, *ওয়াকফে জিন্দেগী*

আজ সমগ্র বিশ্ব করোনা ভাইরাসের করাল থাবায় বিপর্যস্ত। প্রতিদিন বাড়ছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লাশের সংখ্যা। আর যারা সুস্থভাবে বেঁচে আছে তারা সকলে ঘরে বন্দী। সবার মাঝে বিরাজ করছে ভয়, শঙ্কা আর অনিশ্চয়তা।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। যার প্রভাব বা ক্ষয়ক্ষতি মানব সভ্যতাকে বারবার নাড়িয়ে দিয়েছে। স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, হে মানবজাতি! তোমাদের এই সভ্যতা সাম্রাজ্যের উৎকর্ষতা তোমাদের নিরাপত্তা দিতে যথেষ্ট নয়। মানবজাতির অসহায়ত্ব প্রমাণ করেছে মানবজাতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান মহান সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির মুখাপেক্ষী। প্রাচীনকালে আধুনিক ডিজিটাল চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। তাই তখনকার মহামারীতে মৃত্যুর হার বেশি ছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু মানব সভ্যতাকে আরেকবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা কতটা অসহায়। সতর্কতা, নির্দেশনা, আইনের প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আমাদের জীবন-যাপন কতটা বেপরোয়া। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদের বেপরোয়া জীবন যাপন ধীরে ধীরে করোনা ভাইরাসকে আরো ভয়াবহ করে তুলছে।

প্রতিদিন মোবাইল ফোনে সবজান্তা গুগলের নোটিফিকেশন কিংবা ফেসবুকের নিউজফিড, সংবাদ-পত্রের পাতা কিংবা দূরদর্শনের পর্দায় সর্বত্র করোনার ভয়াবহ সরব উপস্থিতি। রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিনোদন ক্ষেত্র পেরিয়ে করোনার উপস্থিতি এখন মানুষের মনোজগতে। কিন্তু এত ভয়াবহ অবস্থা সত্ত্বেও আমরা কি করোনার "করোনা বিধিমালা" মেনে চলছি?

কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও আমরা ঘরে থাকার বদলে বিভিন্ন অজুহাতে ঘর থেকে বের হয়ে পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলছি। প্রশাসন যখন বিভিন্ন এলাকার নিরাপত্তার কথা ভেবে সংক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করছে সেখানে আমরা লুকিয়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করছি। পুরো বিশ্ব যখন থমকে গেছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, মারা যাচ্ছে, সেখানে আমাদের কোন কোন অতি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাই বলছে, এই রোগ অমুসলিমদের জন্য মুসলমানদের কিছুই হবে না। আবার কেউ বলছে আল্লাহ্ চাইলে সুস্থ থাকবো না হলে মরে যাবো এত কিছু মেনে কোন কাজ নাই। ভাব এমন যে আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম করে জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর মহামারীর দিনগুলোতে শিক্ষা ও আদর্শ কী ছিল? হুযুর (সা.) মহামারীর দিনগুলোতে মুসলমানদেরকে যেসব নির্দেশনা দিয়েছিলেন এই লেখায় সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১। ভ্রমণ নিষিদ্ধ এবং হোম কোয়ারেন্টাইন:

মহামারীর দিনগুলোতে হযরত রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রথম এবং প্রধান নির্দেশনা ছিল, এ দিনগুলোতে যেন মানুষ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ভ্রমণ না করে।

حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه" قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَه" يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلاَ يُنْكِرُه" قَالَ نَعَمْ.

উসামাহ বিন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত:

তিনি সা'দ (রা.)-এর কাছে নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তোমরা কোন অঞ্চলে প্লেগের বিস্তারের সংবাদ শোন, তখন সেই এলাকায় প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান কর সেখানে প্লেগের বিস্তার ঘটলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেও না। *(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২০৪, সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭২৮)*

হাদীসের এই শিক্ষা মহামারীর সময় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। মহামারী করোনার এই ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের সকলের উচিত নিজের, পরিবারের, সমাজের নিরাপত্তার কথা ভেবে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় না যাওয়া বরং এই অবস্থায় আমাদের সকলের নিজের ঘরে অবস্থান করে সংক্রমণ রোধে সাহায্যকারী ভূমিকা রাখা উচিত।

২। **সামাজিক দুরত্ব বজায় এবং আইসোলেশন:**

মহামারীর দিনগুলোতে হুযুর (সা.)-এর অন্যতম আদর্শ ছিল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ"

শারীদ বিন সুওয়ায়দ (রা) থেকে বর্ণিত:

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে এক কুষ্ঠরোগী ছিল [যিনি মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়াত করতে ইচ্ছুক ছিলেন]। নবী (সা.) তার নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন: তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বয়আত করেছি। *(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৪৪)*

হুযূর (সা.)-এর এই নির্দেশনা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি শিক্ষা। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে একজন সুস্থ্য ব্যক্তি অসুস্থ্য হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি (সা.) আইসোলেশনের নির্দেশনা দিয়েছেন:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "لاَ يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ"

আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অসুস্থ্যকে সুস্থ্যদের সংস্পর্শে নেয়া উচিত নয়। *(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৪১)*

এমনকি হুযুর (সা.) অসুস্থ্য পশু সুস্থ্য পশু থেকে আলাদা রাখার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ.

আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত:

আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছি, নবী (সা.) বলেছেন: রোগাক্রান্ত উট নীরোগ উটের সাথে মিশ্রিত করবে না। *(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৫১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২৪৭; সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৭৪)*

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সবচেয়ে জরুরী বিষয় হল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সাথে সাথে অসুস্থ ব্যক্তিদের আলাদা আইসোলেশনে রাখা। কিন্তু প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সেনাবাহিনী জেল-জরিমানা করেও মানুষকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাতে পারছে না। কিন্তু হুযূর (সা.)-এর যুগে এবং তার খলীফাদের যুগের দিনগুলোতে মুসলমানরা সামাজিক দূরত্ব এমনভাবে বজায় রাখতেন, মনে হতো এটি শরীয়তের অংশ যার অনুমান এই হাদীস থেকে করা যায়:

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا يَا أَمَةَ اللهِ لَا تُؤْذِي النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ فَجَلَسَتْ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.

ইবনু আবিমুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত,

বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফরত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত এক মহিলার নিকট দিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র দাসী, অন্য মানুষকে কষ্ট দিও না। হায়, তুমি যদি তোমার বাড়িতেই বসে থাকতে! পরে উক্ত মেয়েলোকটি নিজের বাড়িতেই থাকত। একদিন একজন লোক তাকে বলল, যিনি তোমাকে বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। এখন তুমি বের হয়ে আসতে পার। মেয়েটি বলল, জীবদ্দশায় তাঁকে মানব, আর মৃত্যুর পর অবাধ্য হব, আমি এমন স্ত্রীলোক নই। *(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং ৯৪৫)*

৩। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা:**

আমরা বাঙালিরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় থাকার জন্য, এটা বিশ্বাস করি। এখানে সেখানে ময়লা ফেলা, যেখানে সেখানে থু-থু কফ্ ফেলা, অরক্ষিত হাঁচি কাশি দেয়া আমাদের নিত্যকার কাজ। আর হাত ধৌত করার মত সাধারণ জ্ঞানের জন্য আমাদের দেশে কর্মসূচি হাতে নিতে হয়। কিন্তু আজ করোনার জন্য বাধ্য হয়ে হলেও যথাযথভাবে হাত ধৌত করা, ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা তথা স্বাস্থ্যবিধি আমরা পালন করছি এবং শিখছি। কিন্তু এই সকল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। একটি মুসলমান

ছোট বাচ্চাও এটা বলতে পারবে যে, **"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক"**। প্রত্যেক নামাযের পূর্বে একজন মুসলমান অজু করে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। তিনি মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত প্রতি অঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করেন। হুযুর (সা.) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে সামাজিক স্বাস্থ্যবিধিও মেনে চলতেন। হুযুর (সা.) যখন হাই তুলতেন বা হাঁচি দিতেন তখন কাপড় বা হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকতেন। কেননা হাঁচি কাশির মাধ্যমে মাধ্যমে হাজারো রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। (শামায়েলে তিরমিজি)

এক কথায় মুসলমান জাতি এমন এক জাতি যাদের আধ্যাত্মিকতার সাথে সাথে শারীরিক ও আত্মিক পরিচ্ছন্নতা শেখানো হয় এবং পরিচ্ছন্ন থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। যেভাবে কুরআন বলছে,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীগণকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। *(সূরা আল্ বাকারা: ২২৩)*

সুতরাং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। সকল মুসলমানদের উচিত এই শিক্ষার অনুসরণের মাধ্যমে রোগ-জীবাণুকে দূরে রাখা এবং সুস্থ্য থাকা।

৪। **চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা:**

ইসলাম সব ধর্ম অপেক্ষা সব থেকে বেশি বাস্তবিক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত। ইসলাম মানব জীবনকে কঠিন বা বন্দীশালা বানানোর জন্য প্রবর্তিত হয় নি বরং মানুষের জীবনকে সহজ সুন্দর সাবলীল করতে ইসলাম প্রবর্তিত হয়েছে। এক কথায় ইসলাম বাস্তবিক উপায়-উপকরণ অস্বীকার করে না। করোনার মত মানবজাতির এই মহা পরীক্ষার দিনে কিছু গোঁড়া মানসিকতার মানুষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিধি মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রচার করে বেড়ায় যে এটি অমুক ধর্মের জন্য আযাব আমাদের কিছু হবে না। কিন্তু হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ شَهِدْتُ الأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فَقَالَ لَهُمْ "عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلاَّ مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا فَذَاكَ الَّذِي حَرَجٌ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَتَدَاوَى قَالَ "تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ قَالَ "خُلُقٌ حَسَنٌ".

উসামাহ বিন শরীক (রা) থেকে বর্ণিত,

আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় বেদুইনরা নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলো, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন: আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! কোন কিছুতেই আল্লাহ্ গুনাহ রাখেন নি, তবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান হানি করে তাতেই গুনাহ হবে। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমরা যদি (রোগীর) চিকিৎসা না করি তবে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন: আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা কর। কেননা মহান আল্লাহ্ বার্ধক্য ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি যার সাথে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করেন নি (রোগও রেখেছেন, নিরাময়ের ব্যবস্থাও রেখেছেন)। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ বান্দাকে যা কিছু দেয়া হয় তার মধ্যে উত্তম জিনিস কী? তিনি বলেন, সচ্চরিত্র। *(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৪৩৬)*

নবী করীম (সা.) রোগ মুক্তির উপায় স্পষ্ট করতে আরও বলেন:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত:

হারূন ইবনু মা'রূফ এবং আবূ তাহির ও আহমাদ ইবনু 'ঈসা (রহ.)...... জাবির (রা)-এর সানাদে রসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন- প্রতিটি ব্যধির প্রতিকার রয়েছে। অতএব রোগে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা হলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয়। *(ই.ফা. ৫৫৫৩; ইসে ৫৫৭৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬৩৪)*

সুতরাং করোনার এই মহাবিপদে আমাদের সকলের উচিত সতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫। **ফ্রি মেডিকেল সেবা ও অসহায়দের সহায়তা:**

মহামারীর দিনগুলোতে মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং মানবিক সহায়তা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। কারণ আজকের বিশ্বে করানোর জন্য সকল কাজকর্ম বন্ধ। হাজারো মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় মানুষকে ঘরে রাখতে হলে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং চিকিৎসা সেবা তাদের ঘরের দোরগোড়ায় নিশ্চিত করতে হবে। না হলে মানুষ বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে বের হবে। তাই বলা যায় সংক্রমণ রোধ করতে মানবিক সহায়তা এবং চিকিৎসা-সেবা মানুষের নিশ্চিত করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামে বায়তুল মালের পথ চলা হুযূর (সা.) যুগে হয়েছিল কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বায়তুল মালের কার্যক্রম উমর (রা.)-এর যুগে হয়েছিল। হুযূর (সা.)-এর যুগে এবং তার খলীফাদের যুগে বায়তুল মাল থেকে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, বিধবা এবং অন্যদের সাহায্য প্রদান করা হতো। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিপদে মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া হতো। এমনকি রাতের আধারে মহামান্য খলীফা উমরের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার কথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত উমর (রা.) সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কিছু খৃষ্টান ধর্মালম্বী কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত লোকদের সাথে মিলিত হন। তাদের অবস্থা দেখে খলীফা উমর (রা.) সাথে সাথে আদেশ দিলেন যে তাদের জন্য যেন চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়।

মহামারী করোনা পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে আমরা এক দিকে যেমন সংক্রমণ রোধ করতে পারি। অন্যদিকে এই আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পেতে পারি।

তাই আসুন আমরা সবাই করোনার "করোনা বিধি" (স্বাস্থ্যবিধি) মেনে চলি। নিয়মিত হাত ধৌত করি, জীবন যাপনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি, নিজ নিজ ঘরে থাকি, সাধ্যমতো একে অপরকে সাহায্য করি। সর্বোপরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে বেশি বেশি দোয়ায় রত থাকি। তাহলে অতি শীঘ্রই এই মহামারী করাল-গ্রাস থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো, ইনশাআল্লাহ্।

কবিতা

অপেক্ষা

মেহেদী হাসান মুসা

জুতা জোড়া সব ধুলিমাখা হয়ে পড়ে আছে,
কলেজ ব্যাগটাও রক্ষা পায় নি।
আইডি কার্ডটা দেয়ালের সাথে সেপ্টে স্তব্ধরত,
কিন্তু ঘড়ির কাঁটা তিনটে অবিরাম ছুটেছে-
তাদের রক্ষা হয় নি।

সম্পর্কের দোতালা বাড়ির সিঁড়িটাতে
আলোর অভাবে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে শ্যাওলা জমেছে।
দারুণ পিপাসা পিপাসাকে নিবারন করে
অবশেষে তৃপ্ত হয়ে দমে আছে।

কোলাহলময় ব্যস্ত শহরটিও আজ শান্ত ও স্তব্ধ।
বিকেলের জানালাটা খুলে আজ আর শিশুদের চিৎকার থামাতে হয় না,
সাড়া নেই শব্দ নেই,ওরা সব নিজ নিজ বাড়িতে বদ্ধ।
গ্লানি ভরা দু'চোখের লজ্জা আর ধিক্কার ঘুমোতেও দেয় না।

নিরবতা গ্রাম হতে শহরের প্রত্যেকটি পরতে পরতে ছেয়ে গেছে,
যেন সব কিছু থমকে আছে।
যানগুলো জংকারে জর্জরিত প্রায়,
কিন্তু নদী ডিঙ্গিয়ে ওপারে যাবার নৌকাটিতে ভীড়ের কারণে
মাঝিও আজ পারাপারে হিমশিম খায়।

সব কিছু উপেক্ষা করে কেউ মৃত্যুর মিছিলে নিজেকে কল্পনা করে
মুখে ম্লানতার ছাপ গাঢ় করে মাখে,
কেউবা সুস্থ শহরের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে।
এভাবেই কেটে যায় দিনগুলো-
অপেক্ষায় অপেক্ষায়।

***

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"পাক্ষিক আহমদী"** পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঐশী উত্তরাধিকার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতী ও একজন পুণ্যাত্মা সৈয়দ মুজবেহীন আলী

সৈয়দ সোহেল আহমেদ

(১ম কিস্তি:)

যখনই পৃথিবীতে অধর্ম ও নৈরাজ্য দেখা দেয় তখনই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিয়ম অনুযায়ী পৃথিবীতে নবী রসুল বা সতর্ককারী প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন- **লাকাদ বাআছনা ফি কুল্লি উম্মাতিন রাসুলান** *(সূরা নাহল: ৩৭)*। অর্থাৎ আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে নবী-রসূল প্রেরণ করেছি। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে নবী-রসূলগণ ধর্মকে অধর্মের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং নৈরাজ্যকারীদের সাবধান করেন আর মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেন।

ইসলাম যখন চরম সংকটে, মুসলিম ভাইয়েরা যখন পাপাচারে নিমজ্জিত, বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত খ্রিস্টানদের যখন জয়জয়কার, ঠিক সেই সময়ে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে ইমাম মাহদী (আ.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি যখন ইসলামের পুনর্জাগরনের কাজ শুরু করেন, তখনই কুরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী (ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদ) শুরু হয়ে যায় তাদেরকে নিয়ে বিরোধিতা, হাসি-ঠাট্টা। আর একদল শত কষ্ট এবং হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে চিনতে পারেন এবং তাঁর কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সহযোগিতা করেন। মহাপুরুষগণ যেমন নিজে কাজ করেন তেমনি কিছু পুণ্যাত্মা কাজগুলি এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করেন।

১৮৮৯ সালে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যখন ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবি করেন তখন মানুষ যেমন বিরোধিতা করতে লাগলো তেমনি দলে দলে তাকে মানতেও লাগলো কারণ ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী হল– তাঁর (আ.) মাধ্যমে ইসলামের সংস্কার যেমন হবে তেমনি ইসলামের পূর্ণ-বিজয়ও অর্জিত হবে।

তবে বাংলাদেশে এই সৌভাগ্য এসেছে ১৯০৫ সালে চট্টগ্রামের আনোয়ারা নিবাসি আহমদ কবির নুর মোহাম্মদ (রা.)-এর মাধ্যমে। তারপর ১৯০৬ সালে আর একজন পুণ্যাত্মা কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি উপজেলার ধনকি পাড়া তথা নাগেরগাও নিবাসি জনাব রইস উদ্দিন খান (রা.)-এর মাধ্যমে। তিনি ডাক বিভাগে চাকরিরত অবস্থায় ইমাম মাহদী (আ.)-এর কথা শুনে কাদিয়ান গমন করেন এবং তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। তারপর কিশোরগঞ্জের তাতারকান্দি নিবাসি রইসউদ্দিন খান (রা.)-এর সহধর্মিনী সৈয়দা আজিজাতুন্নেসা বয়আত করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রাহে.) কিভাবে আহমদী হন বাংলাদেশে কিভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় তা আমরা বিভিন্ন স্মরনিকা ও পত্র পত্রিকায় জেনেছি। আমাদের দেশের আহমদীদের মধ্যে যারা প্রথম দিকে সক্রিয় ছিলেন সবারই ইতিহাস আমরা কমবেশি জানি। আমি এখন যার সমন্ধে লিখব তিনি হলেন জনাব সৈয়দ মুজবেহীন আলী সাহেব, একজন ক্ষণজন্মা ছিলেন যিনি বিবাহের পুর্বেই মারা যান। তাঁর পুর্ব-পুরুষ জনাব সৈয়দ আকবর আলী সাহেব মধ্যপ্রাচ্য থেকে এদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন। তার পরের পুরুষ জনাব সৈয়দ আমজাদ আলী তদীয় পুত্র সৈয়দ নশ্রত আলী তার পুত্র সৈয়দ আব্দুল আলী, তার ছিল চার পুত্র সৈয়দ খুর্শিদ আলি, সৈয়দ মুজবেহীন আলী আরও দুইজন ছিল সুরুজ আলী ও তোতা আলী অল্প বয়সেই মারা যান। সৈয়দ নশ্রত আলী সাহেবের বোন ছিলেন হযরত রইসউদ্দিন খান সাহেবের মা। সৈয়দ আব্দুল আলী সাহেব ছিলেন বেশ পরহেজগার, এলাকায় বড় পীর ছিলেন এবং তার প্রচুর মুরিদ ছিল (আমার পিতা সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব বড় হওয়ার পর তার মুরিদদেরকে বলেন পরকালে কোন আত্মা কারো জন্য সুপারিশ করবে না। যে যতটুকু নেকী করবে সেই অনুযায়ী তার বিচার হবে। এই বলে তিনি পীরানী ছেড়ে দেন।) সৈয়দ আব্দুল আলী সাহেবের ফুফাত ভাই ছিলেন হযরত রইসউদ্দিন খান সাহেব। তাই তার দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ মুজবেহীন আলী সাহেব বনগ্রাম হাই স্কুলে পড়াশুনার সময় প্রায়ই চাচা রইসউদ্দিন খান সাহেবের ধনকী পাড়া কথিত নাগেরগাও এর বাড়িতে যেতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বিধায় সৈয়দ মুজবেহীন আলী সাহেবকে স্বীয় সন্তানের মত খুব ভালবাসতেন এবং তবলীগ করতেন। তবলিগের মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বুঝতে পারেন এবং ১৯১০ বা ১৯১২ সালে ছাত্র অবস্থাতেই আহমদী হয়ে যান। তার পিতা সৈয়দ আব্দুল

আলী পীর সাহেব এই ঘটনা জানার পর দুইজনের প্রতি খুব রাগ করেন কিন্তু ছেলে খুব সৎ, ভদ্র ও পরহেজগার ছিল বিধায় বেশি কঠোর ছিলেন না। পিতার সাথে ধর্মীয় যৌক্তিক আলোচনা করার জন্য আরও বেশি জামা'ত সম্পর্কে জানার জন্য রইসউদ্দিন খান সাহেবের পরামর্শে তিনি দু'বার কাদিয়ান গমন করেন। দ্বিতীয়বার কাদিয়ান থেকে ফিরে আসার পর দেখেন পিতা পরলোক গমন করেছেন। তারপর তিনি যখন তবলীগ শুরু করেন শুরুতেই বয়আত করেন তার বড় ভাই সৈয়দ খুর্শিদ আলী সাহেব, আমার দাদা অর্থাৎ সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের পিতা। তিনি ছিলেন খুবই শক্তিশালী, প্রভাবশালী এবং সাহসী বীরপুরুষ। যার ফলে মুজবেহীন আলী সাহেবকে কেউ ভয়ে কিছু বলতেন না এবং নির্দ্বিধায় তবলীগ করতে পারতেন। কাদিয়ান থেকে ফেরার পর নিজ মহল্লায় তবলীগ শুরু করেন এতে আব্দুল করিম সাহেবের পাঁচ ছেলে এবং তার বংশের আরও কতিপয় পুণ্যাত্মা প্রথমে আহমদীয়াত কবুল করেন। তিনি এত সুপুরুষ ছিলেন যে, তাকে দেখার জন্য মানুষ রাস্তায় জমা হয়ে যেতে আর দেউরির ভিতর থেকে মহিলারা বলতো দেখো ঐ মীর সাহেব যায়। আমার ফুফা আব্দুর রশিদ সাহেব যার বয়স প্রায় একশ'দু' বছর। তিনি সবসময় পাগড়ি পরতেন এবং রাস্তায় হাঁটতেন ও তবলীগ করতেন। তার মাধ্যমেই তেরগাতি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবেই কটিয়াদি উপজেলার আশেপাশে আহমদীয়াতের বিস্তৃতি। ব্রাহ্মনবাড়িয়াতে জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর যত ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতো তিনি নিয়মিত যোগদান করতেন এবং বক্তৃতা দিতেন। কোন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে সারারাত তবলীগ করে সকালে গোসল করার সময় অসুস্থ্য হয়ে মসজিদুল মাহদীর সামনের পুকুর ঘাটেই মারা যান। তার কবরও ব্রাহ্মনবাড়িয়াতে আছে কিন্তু কোথায় তা আমরা চিহ্নিত করতে পারি নি। তাই এই পুণ্যবানের জন্য দোয়ার আবেদন জানানোর জন্যই মুলত এই লিখাটা লিখলাম। আমরা জামা'তের বিভিন্ন ধর্মীয় বিশেষ দিনে ক্রোড়পত্র এবং জামা'তি পত্রিকায় অনেক বুজুর্গের নাম দেখি ও আমরা তাদের জন্য দোয়া করি। কিন্তু তার সম্পর্কে তেমন কিছু লিখা নাই বলে নামটি অন্তরালেই রয়ে গেছে। বর্তমানে আমার পিতা সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবও খুব অসুস্থ্য, তাই ভাবলাম তার জীবদ্দশাতেই উক্ত ইতিহাসটি সকলের কাছে তুলে ধরি। এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ও ইতিহাস তুলে ধরার অভিপ্রায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। যার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম এবং আমরা আমাদের ঈমানকে তাজা করতে পারব। (চলবে)...

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি সংশোধনী

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ১৫তম শাহেদ কোর্সে জীবন উৎসর্গকরণে আগ্রহী ছাত্রদের ভর্তি করানো হবে ইনশাআল্লাহ। আগামী ১১ জুন-২০২০ ইং এর মধ্যে আবেদনপত্র জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, গ্রাম: আহমদনগর, পোষ্ট: ধাক্কামারা, থানা ও জেলা: পঞ্চগড়-৫০০০ এই ঠিকানায় কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাতে হবে। আগামী ১৮ জুন হতে ২০ জুন-২০২০ তারিখে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইনশাআল্লাহ । তাই আবেদনকারীকে অবশ্যই আগামী ১৭ জুন-২০২০ তারিখ বুধবার বিকাল- ৫.০০ টার পূর্বেই স্ব-শরীরে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে উপস্থিত হতে হবে। এ বছর এইচ এস সি পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন তবে তাকে অবশ্যই এস এস সি-তে আবেদন করার যোগ্য হতে হবে। তবে যদি কোন ছাত্র আগ্রহ রাখেন তাহলে জামেয়াতে ভর্তির পরে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এবার অনুষ্ঠিত এইচ এস সি পরীক্ষায় অংগ্রহন করতে পারবেন।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

মওলানা জাফর আহমদ, শিক্ষক, জামেয়া- ০১৭১৭৬৩৮৫৫২

মোয়াল্লেম জাকির হোসেন, অফিস সেক্রেটারী, জামেয়া- ০১৭২২৮০৯৫৩৪

এ ছাড়া আবেদনপত্র ই-মেইলযোগেও পাঠানো যাবে:

jamia.bd2006@gmail.com

বিষয়টি বাংলাদেশের সকল জামাতে ব্যপকভাবে প্রচার এবং প্রসারের জন্য জামাতের কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে কর্মরত সকল ওয়াকফিনে জিন্দেগীদেরকে ব্যক্তিগতভাবেও ওয়াকফে নও সন্তানদের সাথে যোগাযোগ করে জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তির জন্য উৎসাহ প্রদান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মহান আল্লাহতা'লা সর্বদা আমাদের হাফেজ নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ
সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সংবাদ

ফাজিলপুর জামা'তের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন

গত ২৩/০৩/২০২০ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফাজিলপুরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নুর এলাহী জসিম, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফাজিলপুর। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব উল্লাস আহমদ, নযম বাংলা পরিবেশন করেন সাবিহা আক্তার তমা। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ কুরআন হাদীসের আলোকে পেশ করেন রুমেল আহমদ, স্থানীয় মোয়াল্লেম ফাজিলপুর জামা'ত, ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বাল্যকাল এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রেজোয়ানুল হক খান সাহেব, যয়ীম মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুর। বক্তব্য রাখেন সাইফুল ইসলাম স্থানীয় কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফাজিলপুর। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে মোট ৪০ জন সদস্য-সদস্যা ও একজন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। রাতে তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা ছিল। সকালে পিতামাতা দিবস পালন করা হয়।

রুমেল আহমদ, মোয়াল্লেম

জামালপুর হবিগঞ্জ জামা'তে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন

২৩শে মার্চ বাদ যোহর আহমকদীয়া মুসলিম জামা'ত, জামালপুর হবিগঞ্জে মহান মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জামালপুর এর জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ডা. রফিক আহমদ চৌধুরী সাহেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করেন আকাশ আহমদ চৌধুরী এবং নযম পরিবেশন করেন আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী। এরপর আলোচনা পর্ব শুরু হয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য দেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কবির আহমদ চৌধুরী, মোয়াল্লেম আসলাম আহমদ সাহেব এবং পরিশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। পরে দোয়া করে খাবার পরিবেশন করা হয়, মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিল।

আসলাম আহমদ, জামালপুর, হবিগঞ্জ

তেরগাতীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন

গত ২৩/০৩/২০২০ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেরগাতীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠান বাদ মাগরিব শুরু হয়। দেশের বিশেষ পরিস্থিতির কারণে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সভাপতি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব নজরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট তেরগাতী জামা'ত। প্রথমে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন তানভীর আহমদ এরপর নযম পরিবেশন করেন নাবানুর রহমান প্রান্ত। এরপর ২৩ মার্চ এর প্রেক্ষাপট ও সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা মাসুদ আহমদ মুরব্বি সিলসিলাহ্, তেরগাতী। এরপর সভপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষে করোনা সতর্কতা বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা. মফিজ উদ্দীন, জেনারেল সেক্রেটারী

কমলাপুকুরি জামা'তের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

কমলাপুকুরি জামা'তের উদ্যোগে গত ২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রেসিডেন্ট মোহতরম মিজানুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন, জনাব রিয়াদ হোসেন, নযম পাঠ করেন জনাব শাজাহান আলী। অতঃপর মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মাওলানা ফরহাদ হোসেন, মোয়াল্লেম, মাওলানা মোহাম্মদ মোহসিন, ছাত্র- জামেয়া শেষ বর্ষ এবং জনাব শামসুর রহমান, ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী। সবশেষে সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

কমলাপুকুরি জামা'তের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

কমলাপুকুরি জামা'তের উদ্যোগে গত ২৩ শে মার্চ ২০২০ তারিখে প্রেসিডেন্ট মোহতরম মিজানুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে মহান মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব রিয়াদ হোসেন এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন জনাব শামসুর রহমান, ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী ও জনাব শামীম আহমদ। সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে মিষ্টি মুখ করা হয়।

শামসুর রহমান, ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী

খাকদানের লাজনা ও নাসেরাতদের ৩য় স্থানীয় তা'লিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০৬-০৩-২০২০ তারিখ রোজ শুক্রবার এবং ০৭-০৩-২০২০ তারিখ রোজ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খাকদানের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ক্লাসে প্রথম দিন কুরআন তিলাওয়াত করেন ইসরাত জাহান।

দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খাকদান ইসরাত জাহান (চায়না)। ২ দিনের ক্লাসে শুদ্ধ করে কুরআন পড়া, দোয়া ও অর্থসহ নামায শিখানো হয়। উক্ত ক্লাস পরিচালনা করেন তৌহিদা সুলতানা, ফাতেমা মাহমুদ (ঐশী) এবং ইসরাত জাহান চায়না। দ্বিতীয় দিন পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন কেয়া মনি। প্রেসিডেন্ট সাহেবা দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। ওযুর নিয়ম নামাযের আদব এবং মসজিদের আদব সম্পর্কে বলেন তৌহিদা সুলতানা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা অবলম্বন করা জরুরী কেন– এ বিষয়ে বলেন, ইসরাত জাহান (চায়না)। উক্ত ক্লাসে প্রতিযোগিতা নিয়ে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত ক্লাসে, লাজনা ১৮ জন, নাসেরাত ৪ জন, শিশু ৮ জনসহ মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

তৌহিদা সুলতানা, সেক্রেটারী তা'লিম ও তরবিয়ত

মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের এক আমেলার সভা প্রথমবারের মতো অনলাইন কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত

গত ২৩ এপ্রিল ২০২০ বৃহস্পতিবার রাত ০৮:৩০ ঘটিকার সময় মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের এক আমেলার সভা প্রথমবারের মতো অনলাইন কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় আলহামদুলিল্লাহ। এতে জেলা নাযেমে আলাসহ আমেলার সম্মানিত ১৭ জন সদস্য সংযুক্ত হন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা নাযেম আলা জনাব খালেদুর রহমান ভুইঞা সাহেব। প্রারম্ভে সভাপতি সাহেবের দোয়া, জনাব শাহজাহান চৌধুরী সাহেবের কোরআন তেলওয়াত ও জনাব হাশেম সাহেবের হাদীস পাঠের মাধ্যমে এই অনলাইন আমেলার সভা শুরু হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের সম্মানিত যয়ীমে আলা জনাব এম আরিফ উজ্জামান সাহেবের সঞ্চালনায় কেন্দ্রীয় চিঠি ও সদর সাহেবের দিকনির্দেশনার আলোকে রমজান, তারাবির সালাত, তাহাজ্জুদ নামায, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও চলমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারী সবাই এই বিষয়ে তাদের নিজেদের মতামত তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেন।

প্রথমবারের মতো অনলাইনে আমেলার সভা অনেকের জন্য রোমাঞ্চকর ছিল। সভার শুরুতে যখন ভারচুয়ালি সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছিল তখন অনেককে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায়। এমনকি সবার সালাম ও ভাব বিনিময়ে এক আনন্দঘন মুহূর্তে পরিণত হয়।

কয়েকদিন ধরে যয়ীমে আলা সাহেব এরকম একটি আয়োজনের জন্য বেশ কষ্ট করে আসছেন। প্রথমে হোয়াটস অ্যাপের কথা ভাবলেও বেশি সংখ্যক সদস্য সংযুক্তির কথা বিবেচনা করে পরবর্তীতে স্কাইপিতে এই সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের এই আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় প্রতিকূল পরিবেশেও এরকম সভা অনুষ্ঠান অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। সভার শেষ পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি ও সামগ্রিক কল্যাণ যাচনা করে দোয়া পরিচালনা করেন জনাব সরফরাজ সাহেব।

মোহাম্মদ শামশুদ্দীন হেলাল, চট্টগ্রাম

কোড্ডার উদ্যোগে গরীব-কর্মহীনদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ

গত ০৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখ রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডার উদ্যোগে গরীব কর্মহীন আহমদী ও নন-আহমদী ৪৫টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ সামগ্রী ছিল চাউল, ডাল, আলু, তৈল, সাবান ও পেয়াজ। মসজিদে মাহমুদের সামনের মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের কার্যক্রম জনাব মোস্তাক আহমদ ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট কোড্ডার উদ্বোধনের পর ১০ সদস্য বিশিষ্ট খোদ্দাম ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জামা'তের আমেলার সদস্য, নেতৃস্থানীয় লোকজন এবং ৩ জন নন-আহমদীও উপস্থিত ছিলেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের নিরাপদ রাখুন, আমীন।

মোস্তাক আহমদ ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট

শোক সংবাদ

১

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, মোঃ মোমিনুল ইসলাম, পিতাঃ আব্দুর রহমান, সেক্রেটারী মাল আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জগদল, দিনাজপুর গত ০৬/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে রাত ১১:৩০ ঘটিকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে মৃত্যু বরণ করেন, **(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)**। মরহুম জামা'তের কল্যাণে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি স্থানীয় মানুষের কাছে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তার জানাযায় অনেক অ-আহমদী অংশগ্রহণ করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি মা, স্ত্রীসহ ১ মেয়ে ও ২ পুত্র সন্তানসহ অনেক আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গিয়েছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং পরিবারের সবাইকে নিরাপদে রাখেন সেজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ভগ্নির নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

তানভির আহমেদ, প্রেসিডেন্ট
আ.মু.জা. জগদল, দিনাজপুর

২

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ছোট লাদিয়া হালকার আশরাফ আহমদ লিটন গত ২১ এপ্রিল দিবাগত রাতে ৩:৩০ মিনিটে সিলেট হাসপাতালে মাথায় টিউমার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন, **(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)**। বংলাদেশের সকল জামা'তের ভাই বোনদের নিকট মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে
বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**
২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

New Vol. No. 82 | 20th & 21st Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th May, 2020 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)